Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

"সমস্ত দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঘটনা সাক্ষ্য দেয় ধর্মই মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত এবং ঘৃণাস্পদে পরিণত করেছে। ভারতীয় মানবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য কোন কিছুর যদি বেশি নষ্টামি থাকে তবে তা ধর্মের।"

—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গণবার্তা

সূচি.....	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
২৮, ২৯ সারা ভারত ধর্মঘট	১
দেশে বিদেশে	২
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে....	৩
ভারতে শ্রমিকদের প্রথম হরতাল	৪
ইউক্রেন সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট	৫
পি এস ইউ-র জাতীয় কনভেনশন	৬
আর এস পি'র প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯ মার্চের ভাবনা	৭
ধান চাষে কর্পোরেট ভাইরাস	৮

68th Year 47th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 26th March 2022

সম্পাদকীয়

গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি চাই

তথাকথিত 'অগ্নিকন্যার' অনুপ্রেরণায় অগ্নিবলয়ে প্রবেশ করেছে আমাদের প্রিয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। বারুদের স্তূপে তো আগেই পরিণত হয়েছে এরাজ্যের শহর ও গ্রাম গ্রামান্তর। বিস্ফোরণ হল একুশে মার্চ। বীরভূম জেলার রামপুরহাট সংলগ্ন বগটুই গ্রাম। জনৈক তৃণমূলী নেতা কয়লা, বালি, পাথর পাচারে স্থানীয় পুলিশের উৎসাহী সাহচর্যে অবৈধ কারবারে ফুলে ফেঁপে ওঠা ভাদু শেখের করুণ হত্যার বদলা নেওয়া হল। অন্ততপক্ষে দশ বারোজন নারী শিশু ও তরুণকে জীবন্ত দগ্ধ করা হল বগটুই গ্রামের প্রান্তে। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করেছিল ওই গ্রামের একাধিক গৃহকে। অসহায় মানুষের আর্তনাদ ও বাঁচার আকুতি নীরব হয়ে পড়েছিল স্থানীয় পুলিশের উপস্থিতিতে। সঙ্গে অবশ্যই মুর্হুমুহু বোমার শব্দ। যে মানুষগুলি মারা পড়ল তাদের পরিচয় তৃণমূল কংগ্রেস দলের হতেই পারে। কিন্তু আসলে তো সবাই মানুষ ছিল। তাঁদের হত্যা করেই হয়তো জ্বালিয়ে দেওয়া।

যাঁদের দেহগুলি অঙ্গারে পরিণত হয়েছিল নৃশংসতম বর্বর আক্রমণে তাঁদের গণকবর দেওয়া হল। তা, হল মরদেহগুলি নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত না করেই। এখন এরাজ্যেই এমন ভয়াবহ অনৈতিকতার প্রশ্রয় সম্ভব। ঘটনার অব্যবহিত পরেই বীরভূম জেলার তৃণমূলী প্রধান নিদান দিয়েছিলেন টিভি ফেটে অগ্নিকাণ্ড! এই লোকটিই ওই জেলার সক্রিয় মাফিয়াদের একচ্ছত্র নেতা। প্রকৃত তথ্য গোপন করে নির্মম গণহত্যার অন্যবিধ মান্যতা দেবার অপচেষ্টা করেছেন রাজ্যের এক মন্ত্রী এবং 'অগ্নিকন্যার' সাধের কেষ্ট। বগটুই গ্রামের সমস্ত পুরুষরা আতঙ্কিত হয়ে ঘরছাড়া। সর্বত্র ভীতি। সন্ত্রাসের অপার বিস্তার। হৃদয় বিদারক নরমেধ। মানব সভ্যতার অনপেনয় কলঙ্ক। আর তিনি ব্যস্ত প্রমাণ লোপাটে।

রামপুরহাটের বিধায়ক এই গণহত্যা কাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। তাঁর অনুগামীরাই পুলিশ প্রশাসনের প্রশ্রয়ে সব করেছে। এটাই রেওয়াজ এখন রাজ্যজুড়ে। নির্বাচনে বিরোধী শূন্য করার অপকর্ম করে এই সব চিহ্নিত দুষ্কৃতীরা। পুলিশের উচ্চপদস্থ বৃহদংশ আধিকারিক একান্তভাবেই শাসকদলের দৈনন্দিন পরিচালনার অচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের চাকুরি এবং পদোন্নতি নির্ভর করে পুলিশমন্ত্রীর বদান্যতায়। তাঁকে তুষ্ট করে চলে পুলিশ বাহিনী। বিরোধীদের অস্ত্র বলে দমিয়ে অনন্ত সন্ত্রাসের বিস্তার করে সমস্ত স্তরের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে অক্লেশে ধ্বস্ত করে চলেছে রাজ্যের সর্বোচ্চ মাফিয়ার দল। এরা সভ্যতার কলঙ্ক।

রাজ্যের বামফ্রন্ট নেতৃত্ব পৌঁছে গিয়েছিলেন বাগটুই গ্রামে। অঘটনের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। যে পুলিশ ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে গণহত্যার কুৎসিততম অপকর্মকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তারাই অকুস্থল পরিদর্শনে বামপন্থীদের বাধা দিয়েছে। তবুও সত্য গোপন থাকে না। মানুষ বুঝে নেয় এরাজ্যের করুণ বাস্তবতাকে। কতদিন আর এভাবে একের পর এক হত্যা ও সন্ত্রাসের বিস্তারকে মেনে নেওয়া যাবে! মানুষই ঠিক করবেন ভবিষ্যত।

যশোধরা রায়চৌধুরীর একটি কবিতার কথা মনে পড়ে।

"অবসন্ন হই। বিষণ্ণ ঝিমোই।
এক পাতা লিখি। নিঃশেষিত হই।
গাঢ়তম ভুল। ক্ষান্ত দিই তবে?
এক পাতা লিখে কী এমন হবে?
এত বড় বাঁচা এত ছোট লেখা
একটা পৃথিবী দাহ্য আর একা
এক দেশলাই বিন্দুতে বারুদ
ঘর্ষণ করি। আগুন বুদবুদ
উঠে আয়, আয়। তুলে নাও, ক্ষোভ।
আগুন দেদার। জ্বলো দাউ দাউ
এদিকেও মারো ওদিকে বাঁচাও।
তীক্ষ্ণতা এদিকে। অন্যদিক ঢাল।
বাঁদিকে প্রশ্রয়। ডানদিকে আঘাত।
এক পাতা লেখা। এক অভিঘাত।"

সমস্ত প্ররোচনা এবং দ্বিধা দ্বন্দ্ব জয় করে দেশ বাঁচাতে

২৮, ২৯ মার্চ সারা ভারত ধর্মঘট সফল করুন—আর এস পি

সবক'টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন আগামী ২৮ ও ২৯ মার্চ সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিবাদী ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে শ্রমিক সংগঠনগুলির সম্মিলিত সভায় এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজেপি শুধু নয়, আর এস এস প্রভাবিত বি এম এস এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে দ্বিমত। নরেন্দ্র মোদীর চূড়ান্ত অপশাসন এবং ব্যর্থতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের বর্তমান সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের অনুপ্রেরণা অবহেলা করতে পারেনি বি এম এস। এদের মতো বিপুল সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক সংগঠন। খাতায় কলমে এই সময়ে বি এম এস ই সম্ভবত এদেশে সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিবিড় প্রশ্রয়ে এই সংগঠনটি আরও ব্যাপক অংশের শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ভ্রান্তপথচারী দেশদ্রোহীরাই তো এখন বলতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বি এম এস এর মতোই অন্য একটি পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক সংগঠন তাঁদের নেত্রীর অনুপ্রেরণায় ২৮, ২৯ মার্চ ধর্মঘটের বিরোধিতা করবে। এই নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কুর্সি দখলের আগে পর্যন্ত তাঁর সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে অসংখ্যবার অপ্রয়োজনেও ধর্মঘট ডেকেছেন। কথায় কথায় ধর্মঘট। ভাঙচুর এবং কলকাতা কেন্দ্রীক হাঙ্গামা হুজ্জোতি হয়েছে প্রচুর। রাজ্যের শ্রমকারী মানুষদের বিশেষ কোনো সমর্থন তিনি তখনও পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে সরকারি দখলদারির মাধ্যমে বেশ কিছু শ্রমিক তাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এখন নেত্রী আস্থানি আদানিদের কাছে শর্তহীনভাবে দায়বদ্ধ। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবার পর থেকেই চৈতন্যোদয়! ধর্মঘট করা চলবে না। একান্তভাবেই জনস্বার্থে সমীচীন কারণে ধর্মঘট আহ্বান করা হলেও তাকে সমর্থন করা থেকে বিরত রয়েছে নেত্রীর দল। শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই তাদের সরকার ধর্মঘট বানচাল করার লক্ষ্যে অবিচল। কোনো কারণেই শ্রমিক শ্রেণির অর্জিত অধিকার ধর্মঘটে শামিল হওয়া যাবে না। গায়ের জোরে এবং প্রশাসনিক অধিকারে বানচাল হয়েছে শ্রমিক শ্রেণির মৌলিক অধিকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের দখলদারি তো আপাতত আর এস এস-এর অন্যতম প্রধান শাখা বিজেপি'র নেতা মহামহিম নরেন্দ্র মোদি অগণিত অন্যায়, দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা সিদ্ধান্ত নিলেও মোহন ভাগবত-এর ক্ষমতা নেই তার বিরোধিতা করা। অবশ্য তেমন কোনো ইচ্ছেও নেই। মুখে বা প্রবচনে যাই বলুন এরা বাস্তবে, সবাই দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের দালাল। এক্ষত্রে তারা অখণ্ড ভারতীয়তা বা সনাতন ধর্মভিত্তিক জীবনধারার পরোয়া করে না। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখতে তারা সবাই একজোট।

শ্রমিক শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ বা তা বিস্তৃত বা অগ্রসর করতে গেলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনে সংঘাতের মধ্যে যেতে হতেই পারে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কতিপয় কর্পোরেট কোম্পানির মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনকেই যে সরকার মান্যতা দেয়, সেই সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াই তো একমাত্র নৈতিকতা। দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো একান্তভাবেই সেই নৈতিক অবস্থান নিয়েছে। এই ভূমিকাকে আর এস পি সার্বিকভাবে সমর্থন করে। দেশের সবকটি বামপন্থী দলও এই ধর্মঘটের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, বর্তমান এন ডি এ বা বিজেপি সরকারের দৌরাত্ম্যমূলক আচরণে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। দারিদ্র বেড়ে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। করোনা অতিমারি সমস্যাটিকে আরও ব্যাপক ও জটিল করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু মোদি সরকারের মূল দিশাই দেশের বিপুল সর্বনাশ ডেকে এনেছে। প্রায় প্রতিদিন নতুন করে গরীব হচ্ছেন বহু সংখ্যক মানুষ। বেকারত্ব সীমাহীন। বিগত সাত আট বছর জুড়েই কর্মহীন মানুষের সংখ্যা তীব্র গতিতে বেড়ে চলেছে। কাজ করে বা শ্রম বিক্রি করে যাঁদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে তাঁরা, বিনা কারণে কর্মচ্যুত হচ্ছেন। নতুন কোনো কলকারখানা দেশে নির্মিত হচ্ছে না।

দেশের প্রধানমন্ত্রী রেকর্ড সংখ্যক বার বিদেশ ভ্রমণ করলেও কোনো উল্লেখযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তি বা কৃৎকৌশল এ দেশে আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং নতুন করে কর্মনিযুক্তির প্রশ্নই আর ওঠে না। সরকারি দপ্তরগুলিতে অসংখ্য পদ খালি। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয় ক্ষেত্রেই এ এক অতি যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা। যতটুকু কাজের সুযোগ রয়েছে, তাও ঠিকা বা অস্থায়ী কর্মচারীদের দিনমজুরি নির্ভর। স্থায়ী জীবিকার্জনের সমস্ত সুযোগ অবরুদ্ধ।

মোদি ও মমতা সরকার একসঙ্গে নিরুত্তাপ। তাঁদের কোনো ভাবনাচিন্তাই নেই। অজস্রবার তাঁদের কাছে এমন এক জাতীয় সমস্যা নিয়ে দাবি জানানো হলেও তাঁরা কোনো সদর্থক প্রচেষ্টাই গ্রহণ করেননি। শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি বোধে সরকারের কোনো ভূমিকাই নেই। বরঞ্চ বিপরীতে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করার নীতি নিয়ে চলেছে সরকার।

রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্প উদ্যোগগুলিতে যতটুকু কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল, তাও দ্রুতগতিতে বেসরকারিকরণের চাপে বিপর্যস্ত। একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি যে কী ভয়াবহ সংকটে পড়ছে তা এই সমস্ত অর্বাচীন শাসকদের বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। দিনে রাতে এরা দেশের সামূহিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংকটগ্রস্ত আগ্রাসী পুঁজিকে বাঁচানোর চেষ্টায় চূড়ান্ত অন্যায় পথে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশ বাঁচানোর কর্তব্য শ্রমিকশ্রেণির ওপর। ভারত নামক সুবিশাল দেশের প্রায় ১৩৮ কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন করে শুধুমাত্র বিপুলাকার কর্পোরেট কোম্পানিগুলিকে বাঁচানোর অপচেষ্টা রুখতেই হবে, অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দু'দিনের ধর্মঘটই যথেষ্ট নয়। আগামীদিনে আরও ব্যাপক এবং জঙ্গি আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে ধারাবাহিক অত্যাচার রুখে দেশ বাঁচানোর উদ্দেশ্যকে সফল করতেই হবে।

বিধানসভায় নজিরবিহীন ঘটনা

এবারের বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপালকে নিয়ে নজিরবিহীন ঘটনার অভিজ্ঞতা হল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যবাসীদের। এই রাজ্যে রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই মাননীয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যবাসীদের মনে করিয়ে দেন তিনিই সংবিধান বলে রাজ্যে সংবিধানের রক্ষক। কিন্তু কৌতূকের বিষয় এবারের বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই রাজ্যপাল মহাশয় তার এই প্রধান প্রধান কর্তব্যটি অর্থাৎ সংবিধানের রক্ষকের ভূমিকাটি প্রায় ভুলতে বসেছিলেন।

বিগত দশকগুলিতে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনগুলি বহু অশান্তি, ক্ষোভ বিক্ষোভের সাক্ষী?। কংগ্রেস আমলে বা যুক্তফ্রন্টের আমলে বহু অশান্তি তাণ্ডবের ঘটনা ঘটেছে বিধানসভায়। তবে এবার যা ঘটেছে, অতীতে এমন ঘটনা ঘটেনি। রাজ্যপালের ভাষণ ঘিরে অনেক অশান্তি দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। কিন্তু হট্টগোল ও অশান্তির মধ্যে ভাষণের একটি কথা শোনা না গেলেও প্রাক্তন রাজ্যপালেরা তাঁদের জরুনি ন্যূনতম কর্তব্যটি সমাধা করে দিয়েছেন। অভূতপূর্ব ঘটনা, এবারের বিধানসভার শুরুতে স্পিকার বা মুখ্যমন্ত্রীকে করজোড়ে রাজ্যপালকে ভাষণ পড়ার জন্য আবেদন করছেন। রাজ্যপাল সংবিধানের রক্ষক। রাজ্যপাল স্বয়ং এমন দাবি অসংখ্যবার করেছেন। অথচ তিনিই বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন না করে স্বয়ং একটি সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করতে বসেছিলেন, যা অভাবনীয়। রাজ্য বিধানসভায় এ রকম পরিস্থিতি তো কতবারই হয়েছে। কিন্তু বোঝা গেল না তাতে রাজ্যপালের ভাষণ পাঠে বিশেষ সমস্যা কোথায়। অবশ্য অধিবেশন চলাকালীন শান্ত পরিবেশ সদাই বাঞ্ছনীয়। তাতে সভার কাজ পরিচালনা করতে সুবিধা হয়, কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটনা নাও ঘটতে পারে। তাছাড়া বোঝা কঠিন রাজ্যপাল ধনখড় মহাশয় পুরো ঘটনার দায় শাসকদলের উপরই চাপালেন কেন? অবশ্য এই জমানায় ন্যূনতম শিষ্ট আচরণের আশাটাই দুরাশ বোধ হয়।

ইউক্রেন সঙ্কট — জনৈক ভারতীয় চিকিৎসকের চোখে

সেন্ট পিটার্সবাগ (পুরানো লেনিনগ্রাড কিছুদিন আগেও ছিল পর্যটকদের ঢল। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলির আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় বাতিল হয়েছে প্রায় সব উড়ান। ইউক্রেন-রাশিয়ার বিরোধে সামরিক অভিযানের উত্তাপ বেশ ভালভাবেই টের পাচ্ছেন সেন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দারা। অর্থনৈতিক যুদ্ধের জেরে রুবলের মূল্য দ্রুত নামছে। মানুষের সঞ্চয় কমছে, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। SWIFT ব্যবস্থা থেকে রাশিয়ার বহিষ্কারের পর টাকা লেনদেন করায় বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড কাজ বন্ধ করেছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসের ঢালাও বিক্রিও বন্ধ হয়েছে।

গত মহাযুদ্ধে লেলিনগ্রাড (অধুনা সেন্ট পিটার্সবার্গ) নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধের নজির গড়েছিল সে গৌরবজনক ইতিহাস রাশিয়ানরা এখনও স্মরণ করেন। ইউক্রেনে রুশ বিমানের বোমা বর্ষণের পরও সেন্ট পিটার্সবার্গের সাধারণ মানুষ কিন্তু প্রেসিডেন্ট পুতিনের পাশেই। তাঁরা কেউ যুদ্ধের পক্ষে না হলেও কিন্তু মনে করেন এ ছাড়া পুতিনের কোনো উপায় ছিল না। ইউক্রেনের দক্ষিণে ক্রিমিয়া, ডনেৎস্ক, লুহানস্কে রুশ জনগোষ্ঠীর উপরে সে দেশের 'নব্য নাৎসি' প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী এখানকার সাধারণ মানুষের কাছে সুবিদিত ঘটনা হলেও পশ্চিমি সংবাদ মাধ্যমে এসব কাহিনী জায়গা পায় না। তার উপর এরা ন্যাটো জোটে যোগ দিতে চেয়ে এই চরম শত্রুদের (ন্যাটো জোট) রাশিয়ার ঘাড়ের কাছে ডেকে আনতে চাইছে। এদেরকে তো থামানো প্রয়োজন। পুতিন ঠিক এই কাজটাই করতে চাইছেন। ন্যাটো বা পশ্চিমাদের পূর্ব দিকে অগ্রাসন বন্ধ করতে পুতিনের ইউক্রেনে সেনা অভিযান ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

পুতিন যে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে না সে ভরসা আছে সেন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দাদের। চের্নোবিল ও ইউক্রেনের অন্য পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে রুশ সেনারা যে সামরিক দখল নিচ্ছে সেটার উদ্দেশ্যও হচ্ছে এগুলিকে নিরাপদ রাখা। এমনই মনে করছেন সেন্ট পিটার্সবার্গের বহু বাসিন্দা।

পশ্চিমবঙ্গে কী অচিরেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হতে চলেছে আর তার কিছুদিন পরে গোটা ভারত?

আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবতের উপদেশ, ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দেশের জনসংখ্যা নীতিকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। সঙ্ঘ পরিবার ভারতের জনসংখ্যায় মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে তাদের দুঃশ্চিন্তার কথা বলে আসছে বেশ কিছুদিন ধরেই। সত্যিই কি এদেশের মুসলমানদের জনসংখ্যা ভয়ানক হারে বেড়ে চলেছে? আমরা অনেকেই শুনি, হিন্দুরা তাদের সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখছে, অন্যদিকে মুসলিমরা নাকি এদেশকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ করার জন্য প্রচুর সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। ওদের তো চারটি করে বিবি তার কুড়িটা করে ছেলেপিলে। আমরা অবশ্য জানি সব মুসলমানের চারটে স্ত্রী নেই। কুড়িটা করে সন্তানও নেই। বাস্তব তথ্য কী বলছে? একজন মহিলা সারা জীবনে (১৫-৫০ বয়সে) মোট কত সন্তানের মা হতে পারে তার গড় সংখ্যাকে বলে টোটাল ফার্টিলেটি রেড বা TFR। যেহেতু গড় সংখ্যা তাই সংখ্যাটি সব সময় পূর্ণ সংখ্যা নাও হতে পারে। দশমিক দিয়ে হয় ২.১। মাথায় রাখতে হবে নারী পিছু দুটি সন্তান হলে, বলা যায় দম্পতি পিছু দুটি সন্তান। অর্থাৎ এই দম্পতির যত জন পরের প্রজন্মেও তত জন, একে বলে রিপ্লেসমেন্ট লেবেল। (নানা কারণে অবশ্য শিশুটি হওয়ার আগেই মারা যেতে পারে) তাই দুই-এর জায়গায় রিপ্লেসমেন্ট লেবেল ধরা হয় ২.১ অর্থাৎ রিপ্লেসমেন্ট লেবেল ২.১ হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে না। রিপ্লেসমেন্ট লেবেলে ২.১-এর কম হলে জনসংখ্যা কমতে থাকবে। চিন, জাপান ও উন্নত দেশগুলিতে TFR ২.১-এর নীচে নেমে যাওয়ায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে, জনসংখ্যা কমেও যাচ্ছে।

ভারতের বর্তমান TFR কত?

অনেকেই বলেন ভারতে নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা ৩ থেকে ৪। রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড পপুলেশন এস্পেক্টস অনুযায়ী ভারতে এখন TFR ২.১৭৯। তবে কী সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে এত হইচই করা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে? যেমনটি বলেছেন মোহন ভাগবত মহাশয়, তবে TFR ২.৩ হলেও নানা কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ হতে সাধারণত ৩০-৪০ বছর সময় লেগে যেতে পারে। প্রশ্ন হল, TFR কমে গেলেও মুসলমানদের সন্তান সংখ্যা কি কমছে? আমাদের অনেকের মনের কথা যেহেতু মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নেই, তাদের গাদা গাদা সন্তান হয়। হিন্দুত্ববাদীরা বলেন, ধর্মান্ধ মুসলমানরা সারা বিশ্বকে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, জেহাদি উৎপাদনের জন্য বেশি করে সন্তান উৎপাদনে উৎসাহ দেয়। বাস্তবে কিন্তু মুসলমান প্রধান দেশগুলি অন্য কথাই বলে,

(১) মুসমিল সংখ্যা জরিপ — বাংলাদেশে এখন TFR ভারতের চেয়ে কম। রিপ্লেসমেন্ট (২.২) লেবেলের চেয়েও কম। (তথ্যসূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন....) তবে কিছু দিন চললে বাংলাদেশে শ্রমিকের ঘাটতি পরবে। চিনের মতো সন্তানসংখ্য বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে।

(২) ইন্দোনেশিয়ায় (৮৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান) TFR ২.২৬০ ভারতের চেয়ে সামান্য বেশি। অর্থাৎ দম্পতি পিছু সন্তান সংখ্যা ভারতের ০.০২১টি বেশি।

(৩) মালয়েশিয়ার TFR ১.৭ —ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয়।

(৪) পাকিস্তানের TFR ৩.৩৬৩ হলেও বিহারে TFR ছিল তার চেয়ে বেশি।

(৫) ইরান—আশির দশকের আগে TFR ছিল ৬। কিন্তু ৮০'র দশকের পর থেকে TFR দ্রুত কমতে থাকে। দুই দশকের মধ্যেই তা ২ এর কাছাকাছি চলে আসে। চিন ছাড়া অন্য কোনও দেশে TFR এত দ্রুত কমেনি।

দু একটি ব্যতিক্রম ঘটনা যেমন ইরান বা আফগানিস্তানের কথা বাদ দিলে বিশ্বের অন্য কোনও দেশে মুসলিম বা জেহাদি দিয়ে ভরে দেওয়ার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে সব রাজ্যেই জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে TFR দ্রুত কমছে। ২০১৫ সালে ভারতে মুসলমানদের TFR ছিল ২.৬, হিন্দুদের ২.১। হিন্দুদের চেয়ে সামান্য বেশি। এই সামান্য ফারাক দিয়ে সম্ভবত ভারতকে মুসলিম প্রধান দেশ করে তোলা যাবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলিমদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বেশ কিছু গাফিলতি আছে।

হিন্দু মুসলিমদের বাদ দিয়ে ভারতের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে TFR আরো কম। খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধদের মধ্যে TFR ২-এর কম। তাছাড়া, বাস্তব ঘটনা, উচ্চ অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষদের মধ্যে সন্তান সংখ্যা কম, আর যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নীচের দিকে তাদের সন্তান সংখ্যা বেশি। আবার জাতের বিচারে উচ্চ বর্ণের মধ্যে সন্তান সংখ্যা কম (১.৯) তফশিলি ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে কিছুটা বেশি। অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে TFR বেশি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে TFR সব চেয়ে কম পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও জম্মু-কাশ্মীরে—মাত্র ৬৬। সংখ্যাটি পশ্চিম ইউরোপ বা চিনের সঙ্গে তুলনীয়, ভবিষ্যতে যা বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

জম্মু-কাশ্মীরে জনসংখ্যায় মুসলমানের অনুপাত সবচেয়ে বেশি (৬৮ শতাংশ), পশ্চিমবঙ্গে হলো দ্বিতীয় (৩০ শতাংশ)। অথচ এই রাজ্য দুটিতেও TFR ১.৬। তবে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের (২০১১ সালের সেন্সাস) জন্মহার সামান্য বেশি ২.২ (TFR), তেমন বেশি নয়। এবং আগের অঙ্কের তুলনায় মুসলমানদের জনসংখ্যা দ্রুত কমছে। এবং কমছে খুব বেশি মাত্রায় এক দশকে ১.৯ (TFR)।

আরও একটা প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করছি। আরও বিস্তারিত এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতে মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাহ আইনত সিদ্ধ। এই আইন মুসলিম মহিলাদের পক্ষে অপমানজনক ও তাদের ক্ষমতায়নের পক্ষে এক বড় বাধা। কিন্তু একথাও সত্যি যে আইন থাকলেও সব মুসলমান পুরুষেরা বহু বিবাহ করছেন এমনটা তো নয়। বরং এদেশে বহু বিবাহের হার মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদেরই বেশি।

অতএব পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা, মানে হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাংশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই রাজ্য অচিরেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হচ্ছে না। আর দ্রুত উন্নয়নশীল প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ থেকে কাতারে কাতারে মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাও নেই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনও প্রচারকে অবশ্যই অগ্রাহ্য করা যেতে পারে।

জোর যার মুলুক তার

বিগত দশকগুলিতে লোকসভা, বিধানসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট উপলক্ষে যে কুনাট্য বছরের পর বছর ঘটে চলেছে তাকে গণতন্ত্রের অবমাননা বলা থেকে আপাতত বিরত থাকতেই হচ্ছে। কারণ, এই শব্দবন্ধটিতে রাজ্যবাসী এতটাই অভ্যস্ত এখন, এমন অস্বাভাবিক ঘটনাই এখন স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই রাজ্যে নির্বাচন যুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনকভাবেই বিজয়ী দলের পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে— ত্রিপুরায় নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে যদি বিজেপি জেতে বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই এমন হারে জিতবে না কেন। এমন (কু) যুক্তিতে আমরা চমৎকৃত। তবে এই জমানায় এমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি আরও কুৎসিত আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত সংসদীয় পরিসরে রাজ্যের গণতন্ত্রহীনতা নিয়ে প্রতিবাদ, বিতর্ক অথবা নাগরিক পরিসরে ব্যাপক জনসংযোগে বিরোধী দলগুলির ব্যর্থতাও লজ্জাজনক, শাসক দল বা বিরোধী দল নির্বিশেষে ''জোর যার মুলুক তার'' এর এই যুদ্ধে আসল শহীদ গণতন্ত্র, সব মিলিয়ে—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিতে বর্বরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার থেকে উদ্ধারের পথ আপাতত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইউক্রেন-এ প্রায় চল্লিশ লক্ষ শিশু বাস্তুচ্যুত

রুশদেশের আগ্রাসী যুদ্ধের অবসান হচ্ছে না। পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। হতাহতের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। ইউক্রেনের লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ আতঙ্কে বিধ্বস্ত। পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর মরীয়া চেষ্টায় দেশ ছাড়ছেন তাঁরা। পরিবারগুলি থেকে অনেক ক্ষেত্রেই শিশুরা বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ছে।

ন্যাটো বাহিনীও ইউক্রেন-এর জেলেনস্কি সরকারকে উস্কানি দিয়ে চলেছে। যুদ্ধ থামানোর প্রচেষ্টা না নিয়ে হাজার হাজার ধ্বংসাত্মক অস্ত্র পাঠানো হচ্ছে ইউক্রেনে, এক ভয়াবহ মানবিক সংকট নির্মিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। দিনে রাতে পুতিন বাহিনীর আগ্রাসী গোলাবর্ষণে মনুষ্যত্ব অতীব সংকটে।

এই যুদ্ধের অবসান চাই অবিলম্বে। সাধারণ মানুষকে কামানের গোলা হিসেবে ব্যবহার করা বন্ধ হোক।

‘অতীতের পৃষ্ঠা থেকে’

১৯৪২-এর আগস্টে জাতীয় মুক্ত আন্দোলন প্রসঙ্গে আর এস পি আই-এর গৃহীত প্রস্তাবের অংশ বিশেষ

(১) বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের প্রতিরোধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আমাদের দল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত রণনীতি ও রণকৌশল অনুসারে দেশের খেটেখাওয়া মানুষের হাতে শাসনক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে সর্বহারা শ্রেণি এবং সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভারতের খেটেখাওয়া মানুষের অগ্রণী দল রূপে আর এস পি আই যথাসাধ্য উপযুক্ত শ্রেণি ও গণসংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য প্রয়াসী হয়েছে। একমাত্র এই কারণেই বিগত পঁচাত্তর বছর ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মূল রাজনৈতিক সংগঠনের বৃহত্তর মঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছে। শুধু তাই নয়, এই বৃহত্তর মঞ্চকে অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসকে খেটে খাওয়া মানুষের নেতৃত্বে সংগ্রামী সংগঠন রূপে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণি, শোষিত কৃষিজীবী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য খেটেখাওয়া মানুষের জাতীয় গণতান্ত্রিক এবং আর্থসামাজিক স্বাধীনতার সাংগঠনিক শক্তির অভ্যুদয় রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রয়াসী হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়া মাত্রই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শঋদ্ধ শ্রমজীবী শ্রেণির দল আর এস পি আই-লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতার দর্শনকে সামনে রেখে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্রতী হয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা সমস্ত খণ্ড খণ্ড গণসংগ্রাম এবং শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামকে এক স্রোতে প্রবাহিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

পাশাপাশি কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে সমস্ত সংগ্রামী বামশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী বুর্জোয়া নেতৃত্বের ক্রমাগত সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকদের সঙ্গে ওঠাবসা, গোপন আলোচনা এবং ভাইসরয়ের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির ফেডারেশন গঠন ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কিত বৈঠক যে হরিপুরা কংগ্রেসের গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা— সেই বিষয়টি সম্বন্ধে সর্বক্ষেত্রে সোচ্চার হয়েছে। হরিপুরায় গৃহীত সিদ্ধান্তকে সামনে রেখেই আর এস পি আই ত্রিপুরী এবং রামগড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফেডারেশন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে আপসবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করছে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির দায়বদ্ধতা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা ভারতের মতো উপনিবেশে তখনই সার্থক হবে যদি এদেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে এদেশের শাসক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা যায়। আর এস পি আই মনে করে এটাই এই মুহূর্তে লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতা, কারণ দেশে দেশে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শ্রমজীবী শ্রেণির নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের শর্ত নির্মাণ করেছে। অবিলম্বে আমরাও দেশের খেটে খাওয়া মানুষের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আহ্বান জানাচ্ছি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাতীয়তাবাদী চিনের বিরুদ্ধে নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিরোধে সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক পরিসরে গণতন্ত্রের প্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইঙ্গ-আমেরিকান মিত্রশক্তির প্রস্তাবিত সহায়তার প্রসঙ্গে বলেছে যে, ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে একটি মাত্র শর্তে মিত্র শক্তির পক্ষে লড়াই করতে রাজী আছে। একমাত্র স্বাধীন ভারত সরকারের সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্জনকারী সমাজচেতনায় উত্তীর্ণ ভারতীয় জনগণই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে সংগ্রাম করতে সমর্থ। নতজানু হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব তথাকথিত ব্রিটিশ গণতন্ত্রের শাসকদের অনুরোধ করেছে ইঙ্গ-মার্কিন জনগণ এবং জাতিসংঘ যে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত ভারতবাসীকে সেই সার্বভৌম গণতন্ত্র অর্জন করার অধিকার অর্জন করতে দেওয়া হোক।

ব্রিটিশের জবাব ক্রিপসের প্রস্তাব, যা ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যাঁতাকল এবং আমলাতান্ত্রিক অনড় কাঠামোর সঙ্গে বেঁধে রাখার নামান্তর মাত্র। ভাঙ্গাচোরা কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী এবং অনির্দিষ্ট কালব্যাপী ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসই ব্রিটিশের ছুঁড়ে দেওয়া ছেলে-ভুলানো প্রস্তাব।

সঠিকভাবেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মহাত্মা গান্ধীর ‘ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাবে জাতীয় কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন জানিয়েছে। একমাত্র ভারতবাসী তাদের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রের পতাকা তুলে ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চিনের জনগণের জন্য সর্বশক্তি নিয়ে সংগ্রাম করতে পারে।

এভাবেই ইঙ্গ-আমেরিকান সরকারের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের চরিত্র নগ্ন করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্র সম্বন্ধে আর এস পি আই এর লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা আবার প্রমাণিত হল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আবার প্রমাণ করল যে অক্ষশক্তি যতটা সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্র নিধনকারী শক্তি, ততটাই মানবসভ্যতার শত্রু ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তি।

(৬) আর এস পি আই নিঃশর্তে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধে জাতীয় কংগ্রেসের এই আহ্বানে জানপ্রাণ দিয়ে সংগ্রামের জন্য দায়বদ্ধ। এলাহাবাদ, ওয়ার্ধা, বোম্বেতে জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত হয়েই দলীয় কর্মী সমর্থকদের একনিষ্ঠ সৈনিকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাই। বোম্বে, এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী, নাগপুরসহ সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রামকে আমরা কুর্নিশ জানাই।

একই সঙ্গে ন্যাশনাল ফ্রন্ট (সি পি আই অনুগামী) এবং রায়পন্থী (এম এন রায়) দের নির্লজ্জ অবস্থানে সংগ্রামী শক্তিসমূহকে সামাজিক ফ্যাসিবাদী বলে চিহ্নিত করে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধে শ্রেণি সংগ্রাম গণসংগ্রাম থেকে দূরে থাকা ও ভারত ছাড় আন্দোলনের বিরোধিতাকে আমাদের নিন্দা করার ভাষা নেই। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

(৭) নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বর্তমান সংগ্রামের হাল এখনো দেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বের হাতে। তাসত্ত্বেও নিচুতলার মানুষের লড়াই-এর চাপ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামরিক শক্তি পূর্ব এশিয়ায়, ইউরোপে এবং আফ্রিকায় পর্যুদস্ত হওয়ায় ভারতে শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত। এই সব পরিবেশই দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্বের কাছে তীব্র বিরোধিতার শর্ত তৈরী করছে। অবশ্যই এই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত আপস এবং সংস্কারের সীমা লঙ্ঘন করবে না।

আবার যুদ্ধকালীন সংকট এবং জনগণের সার্বিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জঙ্গি স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব তাদের যে বামপন্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে, এটাই নগ্ন বাস্তবতা। দেশের যে ব্যাপক জনসাধারণের উপর তাদের ভরসা করতে হয় তারা আজ অনেক ব্যাপক লড়াই-এর পরিসর নির্মাণ করেছে। ১৯২১ সাল থেকে ক্রমাগত সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় দেশবাসী ঋদ্ধ। এখন বোম্বে থেকে কলকাতার ট্রামওয়েজ-এর শ্রমিকদের জঙ্গী সংগ্রাম, কানানোর এবং কোয়েম্বাটুরের তাঁতকল থেকে লক্ষ্মৌয়ের রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিক কর্মচারীদের লড়াই দেশব্যাপী দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া খাদ্যদাঙ্গা প্রভৃতি দেশবাসীর বিপ্লবী মানসিকতাপ্রসূত সক্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে।

তাই এই মুহূর্তে নেতৃত্বের সংগ্রামী উপাদান কি আছে না আছে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংগ্রামী খেটেখাওয়া জনতা সহ সমগ্র দেশবাসীর সংগ্রামী শক্তির ক্ষমতা ব্যাপ্তি দুঃসাহস ও ত্বরান্বিত হওয়ার তাগিদ। সংগ্রামী মানুষের এই তীব্র শক্তি ও ত্যাগকে সম্বল করে শেষ পর্যন্ত হয়ত জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের পক্ষে এগিয়ে চলা সম্ভব হবে না।

আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার বিষয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে কিভাবে আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা যায়, সেই বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

১৯৪৬ সালের মে মাসে দিল্লীতে আহূত জাতীয় অধিবেশনে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও গৃহীত প্রস্তাব

(১) **আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গে**

আর এস পি আই এই অধিবেশনে ঘোষণা করছে যে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক লড়াই মূলগত ভাবে অভিন্ন, যতই তা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভিন্ন চেহারায় হোক না কেন অথবা যে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কোনো বিশেষ সময়ে বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তা গর্জে উঠুক না কেন।

এছাড়া আরো ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রতিরক্ষার স্বার্থে সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে সেই দেশের শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম এবং উপনিবেশ সমূহে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রাম মূলত বিভিন্ন ফ্রন্টে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আধিপত্য চূর্ণ করার সংগ্রাম। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দুনিয়ায় শ্রমজীবী মানুষের দায়বদ্ধতা নিজের নিজের দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লবী সংগ্রামকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা ও সর্বতোভাবে নৈতিক সমর্থন করা।

(২) দুঃখের কথা দুনিয়ায় সর্বহারা শ্রেণির এই দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এখন আর সারা পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণির কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নেই যাতে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে বিশ্ববিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়। তৃতীয় আন্তর্জাতিক আজ মৃত। ১৯৩৫ সাল থেকে ডিমিট্রভ, এরুলি এবং ম্যানুলিস্কির অনুশাসনে যেভাবে যুক্তফ্রন্ট এবং গণফ্রন্টের নীতি গৃহীত হয়েছিল, তার ফলে আন্তর্জাতিক সমাজবাদ ও বিশ্ববিপ্লবের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা জনিত সর্বনাশ ঘটেছে। এটি সরাসরি স্তালিনের শুধুমাত্র একটি দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের নীতি অনুসরণ করার বিষময় ফল। এর জন্যই ১৯২৫ সালের পর আর কোনো দেশে বিপ্লব পরিণতি লাভ করেনি। এই সংস্কারবাদী লাইনই শেষ পর্যন্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের স্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ।

পৃথিবীকে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের হাত থেকে মুক্ত করার অছিলায় অধুনা অবলুপ্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিক এবং দেশে দেশে সংগঠনগুলি তার ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়েছিল।

পাকিস্তান বিষয়ক প্রস্তাব

এই অধিবেশন নৈতিক ও আদর্শগত দৃষ্টিকোণে মনে করে যে কোনো গোষ্ঠীর মানবসমাজ যারা, ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে অনন্য এবং একই ধরনের অর্থনৈতিক পরিসরে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করেন, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র হওয়ার অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু, আমরা মনে করি যে ভারতের মুসলমান সমাজ সমগ্র দেশের জনসমাজ থেকে এমন অনন্য গোষ্ঠীভুক্ত নয় যে রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক পরিসরে অবশিষ্ট ভারতবর্ষ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায়।

আমরা মনে করি মুসলিম লীগের এই ধরনের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র মুসলিম নয়, দেশের অন্যান্য জনগণের পক্ষেও ক্ষতিকর। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণি এবং সামন্ত শ্রেণির শোষণের স্বার্থে এই ধরনের দেশভাগের দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। সুতরাং এই কনভেনশনের পক্ষ থেকে জিন্নার প্রস্তাবিত পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে লাহোর প্রস্তাবকে আর এস পি আই সর্বান্তকরণে বিরোধিতা করে।

আজ ভারতবর্ষ যে ঐতিহাসিক পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তা হল দেশের শোষিত জনসাধারণের—হিন্দু মুসলমান সহ সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের শাসন থেকে জাতীয় স্বাধীনতা তথা মুক্তি। পাকিস্তান তত্ত্বে নির্মাতা এবং প্রস্তাবকের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্মীয় ভাবপ্রবণতার মোহ দিয়ে দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং ভয়ানক অবিশ্বাস ও আতঙ্কের পরিবেশ নির্মাণ করা।

কিন্তু এই কনভেনসন যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে লক্ষ করছে যে ইতিমধ্যে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে জিন্নার প্রস্তাব পাকিস্তান গঠনের পক্ষে তীব্র ভাবপ্রবণ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। জিন্না ব্র্যান্ডের পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে আর এস পি আই কর্মীরা সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি হচ্ছেন। আমাদের দল কোন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রসঙ্গে পূর্বে বর্ণিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে কোনো শর্ত বিশ্লেষণ করে বিশেষ প্রকল্প মেনে নিতে রাজী আছে।

১৯৪৭ সালের ১১-১৩ মে আর এস পি আই-এর দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন

১৯৪৭ সালের ১১ থেকে ১৩ মে মুজাফফরপুর (বিহার) এর বৈকুণ্ঠ শুক্লা নগরে আর এস পি'র দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অর্থাৎ ১১ মে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী কম. যোগেশ চ্যাটার্জী। ১২ মে দলীয় রক্তপতাকা উত্তোলন করেছিলেন মুজফফরপুরের প্রথম শহীদ বৈকুণ্ঠ শুক্লার স্ত্রী রাধিকা দেবী। প্রতিনিধি এবং উপস্থিত দলীয় কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ যেখানে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু

এর পর ৭ পাতায়

ভারতের শ্রমিক শ্রেণির প্রথম হরতাল ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে

হাওড়া স্টেশনের ১১০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে

তখন কোনও দল ছিল না, কিন্তু ধর্মঘট ছিল

অশোক ঘোষ

দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে দেশের ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। আঞ্চলিক ভিত্তিতে ও শিল্পভিত্তিক বহু ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘটের সমর্থনে পথে নেমেছে। দেশের প্রধান প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে। দেশের কৃষক সংগঠন সমূহের যুক্ত মোর্চা সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা শ্রমিক সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ধর্মঘট সফল করতে পথে নেমেছে দেশের ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সমাজ। দেশব্যাপী আওয়াজ উঠেছে—দেশ বাঁচাও, শ্রমজীবী মানুষকে বাঁচাও, অধিকার রক্ষা ও দাবি আদায়ের ধর্মঘটে সামিল হও।

কেন এই সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান? ধর্মঘটের দাবিগুলি কী কী?

কৃষিকাজে আর সংসার চালানো যাচ্ছে না। ক্রমাগত পেশা বদল করছে মানুষ। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশান্তরে যাচ্ছে মানুষ শুধু দু'মুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে যাচ্ছে মানুষ। অন্য দেশে যাচ্ছে মানুষ। কিন্তু শহর বা গ্রাম, কোথাও শ্রমের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না শ্রমজীবী মানুষ। একবেলা পেট ভরে খাবারের সংস্থা করতে পারছে না সাধারণ মানুষ।দৈনিক আয় বা ক্রয়ক্ষমতা ২ ডলার বা তারও কম এইরকম দরিদ্র লোকের সংখ্যা করোনো সংক্রমণের সময়ে ৬ কোটি থেকে বেড়ে ১৩.৫ কোটি হয়েছে। ৪৫ বছর পর ভারত আবার 'দরিদ্রবহুল দেশে'র তকমা পেতে চলেছে। ১৫ থেকে ১৯.৫ কোটি মানুষ ২০২১ সালের শেষে নতুন করে দরিদ্র হতে চলেছে। সূত্র ঃ পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর রিপোর্ট। ২০২১ এর শুধুমাত্র নভেম্বর মাসে ৬৮ লক্ষ বেতনভোগী মানুষ কাজ হারিয়েছে। শহরাঞ্চলে ৯ কোটি ভারতবাসী বেকার। শহরে থাকা ২৩ শতাংশ যুবক-যুবতীর কোনও চাকরি নেই। ২০১৩ সালে কর্মক্ষম মানুষ ছিল ৭৯ কোটি। ঐ সময়ে কাজে নিযুক্ত মানুষ ছিল ৪৪ কোটি।

২০২১ সালে কর্মক্ষম মানুষ বেড়ে দাঁড়ায় ১০৬ কোটি। কাজে নিযুক্ত মানুষ কমে দাঁড়ায় ৩৮ কোটি। ২০১৩ সালে মহিলা শ্রমশক্তির কাজে নিযুক্ত ছিল ৩৬ শতাংশ, ২০২১ সালে কমে দাঁড়ায় ৯.১৪ শতাংশ।

২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে ব্যাপক কর্পোরেট কর ছাড়। দেশি বড় কোম্পানিদের একটা বড় অংশের কর ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২ শতাংশ করা হয়।

বাজারে উদ্দীপনা যোগাতে কর-অব্যাহতি পায় এমন কোম্পানিদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৮.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়। ২০১৪-২০২১ কর্পোরেটদের মোট ১০.৭২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হয়েছে। কার্যত দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে কর্পোরেট তোষণকারি মোদি সরকার।

শ্রমকোড ২০২০ শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষাকে আর সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। নতুন শ্রমকোড অনুযায়ী যেসব নির্মাণ শ্রমিকেরা ব্যক্তিগত ছোট বাড়ির নির্মাণ কাজে যুক্ত তারা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় থাকছেন না।

পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য ভাণ্ডার তৈরি ছাড়া, তাদের জন্য কোনও রকম বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কথা নেই শ্রম কোডে। গিগ ও প্লাটফর্ম শ্রমিকদের অন্তত অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবেও চিহ্নিত করছে না শ্রমকোড।

শ্রমকোডের মধ্যে দিয়ে সামাজিক সুরক্ষার আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছেন এমন ব্যাপক অংশের শ্রমজীবী যেখানে কোনও স্পষ্ট নিয়োগকর্তা নেই বা যারা স্বনিযুক্ত ও স্বনির্ভর। তারা সামাজিক সুরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

২০২১ সালে প্রথম নয় মাসে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ২০৫ টাকা এবং দেশের অনেক জায়গাতেই একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১০০০ টাকারও বেশি। পেট্রোল, ডিজেলের ও কেরোসিন তেলের দাম সর্বকালীন বৃদ্ধি হয়েছে। ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ৩.৬১ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করেছে পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর কর বসিয়ে। আর ঐ একই সময়ে ভারতে প্রায় ১৬ কোটি লোক কাজ হারিয়েছেন। সরকারের নতুন বিনিয়োগের অর্থ আসছে 'কর' থেকে নয়। দুটি উপায়ের ব্যাঙ্ক ও এল আই সি'র মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিলগ্নিকরণ এবং সরকারি জমি, রেললাইন, স্টেশন, বিমানবন্দর, বন্দর ও অন্যান্য সরকারি সম্পদ সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে। দেশের প্রতিরক্ষার ৪৯ শতাংশ বেসরকারিকরণ করেছে বিজেপি সরকার। বি এস এন এল-এর ৮৫ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ও এন এস পি'র মধ্যে দিয়ে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, আই সি ডি এস, ও মিড ডে মিল প্রকল্পকে বিক্রির নীল নকশা প্রস্তুত হয়েছে।

২০২১ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ১০৯টি দেশের মধ্যে ভারত দারিদ্র্যের বিচারে ৬৬তম অবস্থানে আছে। ২০২১ সালের তথ্যানুসারে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত ১১৬টি দেশের মধ্যে ১০১ নম্বরে। ভারতে ২০২১ সালেও ৫ বছরের কম বয়সের ১৮ লক্ষ শিশু ভয়ানক অপুষ্টিতে ভোগে। ভারতের স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ মাত্র ২.৫ শতাংশ, যেখানে পৃথিবীর বাকি দেশগুলিতে স্বাস্থ্যখাতে গড়ে কমপক্ষে ৬ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। বি পি এল তালিকাভুক্ত ৭ শতাংশ মানুষ ও অসুস্থ রোগীদের অন্তত ২৩ শতাংশ কোনওরকম স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পায় না।

কর্পোরেট পুঁজির সেবায় নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সম্পদ বিক্রি করে চলেছে। কার্যত দেশ ক্রমশ দরিদ্র হচ্ছে। জাতীয় সড়ক ২৬৭০০ কিমি বিক্রির বিনিময়ে ১,৬০,০০০ কোটি টাকা রেলের ৪০০ স্টেশন, ২৪০০ কিমি রুট, কোঙ্কন রেলওয়ে বিক্রির বিনিময়ে ১৫২৪৯৬ কোটি টাকা, বিমান বন্দর ২৫টি, সরকারের রোজগার ২০,৭৫২ কোটি টাকা। কয়লা খনি—১৬০টি। কয়লাখনির সম্পদ হস্তান্তরের বিনিময়ে ২৮,৪৭৪ কোটি টাকা, প্রাকৃতিক গ্যাস ৮, ১৫৪ কিমি জাতীয় গ্রিড ২৪,৪৬২ কোটি টাকা। স্টেডিয়াম—জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের—১১,৪৫০ কোটি টাকা সরকারের রোজগার।

মেক ইন ইন্ডিয়ার আড়ালে বিশ্বের ধনীতমদের তালিকায় নাম উঠেছে আম্বানি ও আদানি গোষ্ঠীর। আর ভারতে বেড়েছে বঞ্চনা, দারিদ্র, কৃষক আত্মহত্যা। ভয়াবহ বেকারি আর অনাহার।

ধর্মঘটের দাবিসমূহ ঃ

১। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করো।

২। শ্রমকোড এবং এডসা (এসেনসিয়াল ডিফেন্স সার্ভিসেস এ্যাক্ট) বাতিল করতে হবে। জাতীয় স্তরে ন্যূনতম বেতন চাই।

৩। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সহ ব্যাঙ্ক, বীমা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে।

৪। আই সি ডি এস সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীদের ন্যূনতম মজুরী ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করতে হবে।

৫। বিভিন্ন প্রকল্পের ঠিকাকর্মীদের স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে স্থায়ীকর্মীদের মতো বেতন দিতে হবে। 'হায়ার এ্যান্ড ফায়ার বন্ধ করো।

৬। আয়করের বাইরে থাকা সকল নাগরিকদের মাসে নগদ ৭৫০০ টাকা ও বিনামূল্যে রেশন দিতে হবে।

৭। সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষা চাই।

৮। পেট্রোল ডিজেলের দাম কমাতে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক কমাতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম কমাও।

৯। জাতীয় পেনশন প্রকল্প বাতিল করতে হবে। প্রবীণ পেনশন চালু করতে হবে। ন্যূনতম পেনশন যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে হবে।

১০। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটে আরও ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

১১। অতিমারির সময়ে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের জন্য সুরক্ষা ও পেনশনের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১২। 'মনরেগা' প্রকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও তা শহরেও প্রয়োগ করতে হবে।

গোটা দুনিয়া জুড়েই গত তিন দশকে সংগঠিত হয়েছে বহু ধর্মঘট।

১৯৯১ সালের দেশে নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কার নীতির হাত ধরে চালু হওয়া সংস্কারনীতির বিরুদ্ধে এই দেশ দেখেছে একের পর এক ধর্মঘট। যত সময় এগিয়েছে ততো আরও বেশি বেশি সংখ্যায় শ্রমজীবী মানুষ সামিল হয়েছেন ধর্মঘটে। শুধু জাতীয়স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের দাবি আদায়ে আরও সংগঠিত হয়েছেন।

এত বেপরোয়া এই মোদী সরকার যে গত দু'বছরে অজস্র দাবিপত্র পেশ করা থেকে শুরু করে দু'দুবার সারা দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটে কয়েক কোটি শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। দিল্লীতে অবস্থানরত কৃষকরাও এই সব ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা করারও দরকার বোধ করেনি। তাই বাধ্য হয়েই আবার ধর্মঘটে সামিল হয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ। প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দর্শনবোধ ও নিবিড় চর্চা ব্যতীত কোনো বিপ্লবী সংগঠন হতে পারে না—মনোজ ভট্টাচার্য

গত ২০ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়িতে তমলুক জোনাল কমিটির আহ্বানে গণবার্তা পত্রিকার পাঠক গ্রাহকদের নিয়ে একটি মহতী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংযুক্ত কিষাণ সভার সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কম. সর্বেশ্বর মাইতি।

তমলুক জোনাল সম্পাদক কম. সুবল সামন্ত এই আলোচনা সভার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। কম. সামন্ত সভায় উপস্থিত সদস্য সদস্যদের গণবার্তা পত্রিকার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের আবেদন জানান।

আলোচনা সভার প্রথমে বক্তা বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী লেখক কম. পার্থসারথি দাশগুপ্ত তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় আর এস পি দল প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে তুলে ধরেন পরাধীন ভারতে আপসবিরোধ শক্তির দীর্ঘ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি। ত্রিপুরি কংগ্রেসে গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গঠন ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নেতাজীর নেতৃত্বে আপস বিরোধী মঞ্চ তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে ভবিষ্যত স্বাধীন ভারতের ক্ষমতা শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব করার লক্ষ্যে মুখ্যত অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীরা ১৯ মার্চ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বিহারের রামগড়ে আর এস পি দল প্রতিষ্ঠা করেন। সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

সভার প্রধান বক্তা আর এস পি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও গণবার্তা পত্রিকার দীর্ঘদিনের সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, ''সমাজতান্ত্রিক দর্শনবোধ ও নিবিড় চর্চা ভিন্ন কোনো বিপ্লবী সংগঠন হতে পারে না। বিপ্লবী সংগঠনের পরিচয় তার সদস্য সংখ্যায় নয়, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নয়, বিপ্লবী সংগঠনের পরিচয় তার চিন্তাভাবনায় এবং বাস্তব কর্মধারায়। ঐতিহাসিক মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্পর্ধাই একটি বিপ্লবী দলের প্রকৃত অভিজ্ঞান। ১৯৪০ সালে ১৯ মার্চ যে লক্ষ্যে আর এস পি দল গড়ে উঠেছিল সেই লক্ষ্য সম্পর্কে নিরন্তর চর্চা করতে হবে। স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস ছিল মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত ডানপন্থী ও বামপন্থীদের মিলিত মঞ্চ। আপসহীন বিপ্লবী সহ সকল মতাদর্শের মানুষই কংগ্রেসে ছিলেন।

২৯ জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে নেতাজীর সভাপতি নির্বাচিত হওয়া ও ২৯ এপ্রিল ১৯৩৯ নেতাজীর পদত্যাগ করার পর বহুসংখ্যক দক্ষিণপন্থী শক্তি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে গিয়েছিল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী শক্তির মধ্যে জাতপাতের রাজনীতির প্রভাব ছিল, হিন্দু মুসলমান সহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও ছিল। বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসির বিরোধিতায় উকিল আসফ আলি ও সহযোদ্ধা আসফাক উল্লাহর ঐতিহাসিক ভূমিকা উল্লেখ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা কম. ভট্টাচার্য বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন। ভগৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে ওকালতি করেছিলেন জনৈক হিন্দু মহাসভার নেতা।

বর্তমানে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি বিজেপি ভারতকে জাতিতে জাতিতে ও ধর্মে ভাগ করার জন্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার অনবরত চেষ্টা করে

এরপর ৮ পাতায়

ইউক্রেন সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে রাশিয়া-চিন সম্পর্ক

দিলীপ গোস্বামী

ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এর প্রথম সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের নজর আকর্ষণ করেছে। দুই মহাশক্তিধর দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এই বৈঠক বলাবাহুল্য, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এমন একসময়ে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, যখন ইউক্রেনের মাটিতে ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে মুখোমুখি লড়াইয়ের প্রাকমুহূর্ত। রাশিয়া-চিনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দাবি আন্তর্জাতিক সাম্য ও ন্যায় বিচারের আদর্শ তুলে ধরার লক্ষ্যে রাশিয়া এবং চিনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আমেরিকার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে এই দুই দেশ যৌথভাবেই প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ে তোলার অঙ্গীকারই করা হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে রাশিয়া, চিন যৌথভাবে লড়াই করবে এমন প্রতিশ্রুতি রয়েছে যৌথ বিবৃতিতে। পুতিন, জিন পিং-এর শীর্ষ বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে—''আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এক নতুন যুগে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি যা রাশিয়া চিনের মধ্যে গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগের সময়কালের যে কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক মৈত্রী ও সহযোগিতা অপেক্ষা গুণগত বিচারে ভিন্ন প্রকৃতির এবং ফলপ্রসু হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন নেতৃদ্বয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক মেরু বিশ্বের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঐকমত্য হলেও বাস্তবত রাশিয়া চিনের বর্তমান সম্পর্ক বেশ জটিল ও বহুস্তরীয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দুই দেশের ভিন্ন মত পোষণ করার পরিসরটাও উপেক্ষনীয় নয়।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগের সময়কালে রাশিয়া চিনের মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য দুই দেশের সম্পর্ক অবিশ্বাস ও পারস্পরিক সন্দেহের জন্য বেশ জটিলই ছিল। কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল। বিগত শতাব্দীর ছ'য়ের দশকে চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়নে যুক্ত সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদদের হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় চিন বেশ বিপাকেই পড়েছিল। যাক সে সব সুবিদিত ইতিহাসের ঘটনাবলি। ১৯৫৮ সালে নিকিতা ক্রুশ্চভের চিন সফরের পর দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর ১৯৬৯ সালে সোভিয়েত নেতা গর্বাচেভের চিন সফরের সময় দুই দেশের বৈরীমূলক সম্পর্কের অবসানের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়। ঠিক ঐ সময়েই চলছিল তিয়েনমেন স্কোয়ারের ইতিহাস খ্যাত ছাত্র আন্দোলন। এই সফরকালে গর্বাচেভ এমন কোনো মন্তব্য করেন নি যা, তদানীন্তন চিনা নেতৃত্বের ক্ষোভের কারণ হতে পারে। গর্বাচেভ এবং চিনের সর্বোচ্চ নেতা দেঙ জিয়াং পিং ঘোষণা করেন, দুই দেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক সংহতিকে দুই দেশই মান্যতা দেবে। সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। সাম্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই হবে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের এক দশক পর অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত রাশিয়া পশ্চিমা শক্তিগুলির শত্রুতামূলক আচরণে হতাশ এবং অপমানিত হয়ে চিনের সহযোগিতা কামনা করে। চিনের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিনের কাছে দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা কামনা করে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এক বার্তা প্রেরণ করেন। ২০০১ সালে চিন এবং রাশিয়ার মধ্যে এই মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এবং দুই দেশের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিসরটি আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যই নির্ধারিত হয়েছিল এই চুক্তিতে। চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া চিনকে প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম বিক্রি করবে, শক্তি (জ্বালানি) সরবরাহ করবে এবং তাইওয়ানের উপর চিনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথাও বলে রাশিয়া। রাশিয়া-চিনের এই চুক্তি অবশ্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কোনও অস্বস্তির কারণ ছিল না। গত জুন মাসে রাশিয়া চিনের মধ্যে এক বৈঠকে (Virtual) পূর্বোক্ত চুক্তিটির পরিসর আরও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুতিন চিনের প্রেসিডেন্ট জিন পিংকে বলেন, সারা বিশ্বেই রাশিয়া এবং চিনের সহযোগিতা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাশিয়া চিনের মধ্যে সহযোগিতার চুক্তিটি এক উজ্জ্বল উদাহরণই হবে।

২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলের পর মস্কোর সঙ্গে আমেরিকা ন্যাটো এবং ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে দ্রুত সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে এবং রাশিয়াও চিনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্মাণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাশিয়া চিনের সম্পর্ক এক মেরু বিশ্বের বিপরীতে নতুন এক সম্ভাবনার সুযোগও সৃষ্টি করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া চিনের সহযোগিতা কামনা করে। রাশিয়ায় চিনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে চিনে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ করার জন্য ৪০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের এক চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার GAZPROM ২০২৫ সাল থেকে ৩০ বছর বার্ষিক ৩৮ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (bcm) হারে চিনে গ্যাস সরবরাহ করবে। প্রসঙ্গত ২০১৯ সাল থেকে চিনে সাইবেরিয়ার গ্যাস রপ্তানি শুরু হয়েছিল এবং গত বছর চিনের ১৬.৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (BCM) গ্যাস চিনে রপ্তানি করা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে দুই দেশের মধেও বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বর্তমানে চিন রাশিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। রাশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত ইউরেশিয়ান ইকনমিক ইউনিয়ন এবং চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প একযোগে কাজ করার জন্য ঐকমত্য হয়েছে বলে জানা গেছে। রাশিয়া ও চিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের কাজ কয়েক বছর ধরে চললেও ইউক্রেন সঙ্কটে এই সম্পর্ক আরও নিবিড়, আরও ঘনিষ্ঠ করার বিশেষ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। দুই দেশই আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। আমেরিকা ও পশ্চিমের দেশগুলির আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পর চিন বিকল্প পথের মাধ্যমে রাশিয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের চিন সফর কালে চিনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দুই দেশের নিরাপত্তা রক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। ন্যাটো ইউক্রেন যুদ্ধে যদি সত্যিই যোগ দেয় এবং ন্যাটো পূর্ব দিকে আরও অগ্রসর হয় তবে রাশিয়া সর্বশক্তি দিয়েই এই আগ্রাসন প্রতিরোধ করবে এবং চিনও সহযোগিতার হাত বাড়াতে ইতস্তত করবে না। পাশাপাশি রাশিয়াও চিনের নীতিকে সমর্থন জানিয়ে তাইওয়ানের স্বাধীন তাইওয়ান হওয়ার চেষ্টাকে প্রতিরোধ করবে। চিন রাশিয়া এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণনীতির সবরকম বিরোধিতা করবে।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে চিন-রাশিয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও কিছু জটিল বিষয় আছে যেগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমের দেশগুলির বিরুদ্ধে আনুমানিকভাবে এখনও কোনো নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হয়নি বা মতাদর্শগত ঐক্য বা অংশীদারত্বের বিষয়টির ঠিক ঠিক আলোচনা হয়নি। পুতিন ও জিন পিং-এর যৌথ বিবৃতিতে ন্যাটোর পূর্বদিকে এগিয়ে আসার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা থাকলেও বিশেষভাবে ইউক্রেন সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। ২০১৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ক্রিমিয়ার গণভোটের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় চিন ভোট দানে বিরত ছিল। উপরন্তু এখন রাশিয়া চিনের মধ্যে কেন দহরম মহরম চললেও, চিন এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলকে স্বীকৃতি দেয় নি।

মজার বিষয় এই সময় চিনের তুলনায় রাশিয়ার GDP মাত্র এক দশমাংশ হলেও রাশিয়া তার পুরানো বৃহৎ শক্তির (Super power) মর্যাদার ইতিহাস এখনও ভুলতে পারেনি এবং চিনের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ অংশীদারের (Junior Partner) অবস্থানটা মেনে নেওয়াটা রাশিয়ার পক্ষে বেশ মুস্কিল। রাশিয়ার কাছে বাস্তব সত্যিটা হল, বন্ধু হোক বা না হোক, দর কষাকষির ক্ষেত্রে চিন এক চুল জমি ছাড়তেও প্রস্তুত নয়। চিনের সঙ্গে গ্যাস সরবরাহের চুক্তি সম্পাদনের সময় চিনের সঙ্গে কঠিন দরকষাকষি হয়েছিল এবং রাশিয়া যথেষ্ট ওয়াকিবহাল যে জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ শুরু হলে রাশিয়ার মুনাফার পরিমাণ অনেক বেশিই হবে। উপরন্তু মধ্য এশিয়ায় দুই দেশের মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলা হলেও মস্কো এখনও এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তাদের খাস তালুক বলে মনে করে।

তাছাড়া ইউক্রেনে রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেও চিনের খুব বেশি উৎসাহ থাকার কথা না। ইউক্রেন সঙ্কট অরও ঘনীভূত হলে, হয়ত দক্ষিণ চিন সাগর থেকে আমেরিকা তার সমরসম্ভার কিছুটা সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেও, চিন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর এক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বাস্তব ঘটনা হল, চিন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরস্পরের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। রাশিয়ার সঙ্গে চিনে ব্যবসা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। সত্যিই যদি যুদ্ধ শুরু হয় চিন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে কিনা তা কোটি টাকার প্রশ্ন।তাছাড়া চিনের Belt and Road initiative প্রকল্পে ইউক্রেনের অবস্থানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেনের CORN (ভুট্টা) চিনকে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক যুদ্ধের সময় বিশেষ সাহায্য করেছিল।

পরিশেষে, ইউক্রেন সঙ্কট নিয়ে বর্তমানে জটিল আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষিতে চিন রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়ে বেশি বাড়িয়ে বলা ঠিক হবে না। আবার কমিয়ে বলা বা এই নতুন গড়ে ওঠা সম্পর্ক উপক্ষো করাও ঠিক হবে না।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে চিন হয়ত কিছুটা বিভ্রান্ত। ইউক্রেন ও রাশিয়া দুই দেশের মধ্যে চিনের সম্পর্ক ভাল বলেই বেজিং-এর কাছে ভারসাম্য বজায় রাশার চেষ্টা করতে হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে রাশিয়ার বিরোধিতা হলেও চিনের পক্ষে ইউক্রেনের দিকে ঝুঁকে পড়া সম্ভব না।

মোদ্দা কথা, এই মুহূর্তে চিনের পক্ষে ধনী, সম্পদশালী ও শক্তিশালী প্রতিবেশী রাশিয়াকে চটাতে চাইবে না এবং বাহ্যিক ভাবে নিরপেক্ষ অবস্থান নিলেও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদনে জানিয়েছেন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হোক এবং পুতিনও তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছন।

নদীয়া জেলা জুড়ে আরএসপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

গত ১৯ মার্চ ২০২২ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নদীয়া জেলা জুড়ে আর এস পি-র ৮৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। কল্যাণী, গয়েশপুর, রাণাঘাট, তাহেরপুর, কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, নাকাশিপাড়া সহ সমস্ত জায়গায় দলীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং প্রকৃত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-এর নিরিখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। আর এস পি রাণাঘাট লোকাল কমিটির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য মিছিলের ও কর্মীসভার আয়োজন করে ১৯ মার্চ-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও আপসহীন সংগ্রামের জন্য নিজেদের তৈরি এবং জনসাধারণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দলের আদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্য উদ্যোগী হবার শপথ নেওয়া হয়।

দিল্লিতে পি এস ইউ-এর জাতীয় কনভেনশন

দীর্ঘ দুই বছরের কাছাকাছি সময় গোটা বিশ্বের সাথে সাথে আমাদের দেশও করোনা অতিমারির মুখোমুখি। এই সময়ে আমাদের দেশের প্রায় আশি শতাংশ মানুষের জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত। অন্যদিকে কর্পোরেট পরিচালিত শাসক গোষ্ঠী লকডাউন-করোনার সুযোগকে ব্যবহার করে কর্পোরেট আগ্রাসন নামিয়ে এনেছে দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, কৃষিক্ষেত্র থেকে শুরু করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ওপরেও। এই সময়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বাজারের হাতে তুলে দিতে নয়া শিক্ষানীতির নামে নীল নকশা এঁকেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার।

পিএসইউ গত ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকে এর বিরুদ্ধে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সোচ্চার হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা বিজেপির মুখোশ খুলে দেবার জন্য পুস্তিকা ছাপিয়েছে। সাংগঠনিক সামর্থ্য অনুযায়ী মিটিং করেছে। প্রচার আন্দোলন এক বিশেষ স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে। এই প্রেক্ষাপটেই গত ১২ মার্চ ২০২২, সংগঠনের সর্বভারতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল নয়াদিল্লীতে। এই কনভেনশনে আটটি রাজ্যের প্রায় ৯০ জন ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। কনভেনশনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ কম. নওফেল সাফিউল্লা ও কম. ফেবি স্ট্যালিন। শহীদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে কনভেনশন শুরু হয়।

এই কনভেনশন উদ্বোধন করেন ছাত্র আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা তথা বর্তমানে আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। কম. ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বর্তমান সময়ে ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেন। সেই সাথে তিনি বলেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচাতে যেমন একদিকে পিএসইউ-এর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সেই সাথে বর্তমান কেন্দ্রের সরকার যেভাবে দেশের বহুত্ববাদী ভাবধারার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তা থেকে আমাদের দেশ ও দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতেও ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

এই ঐতিহাসিক কনভেনশনের প্রতিনিধিস্তরীয় আলোচনা পরিচালনা করার জন্য কম. কৌশিক ভৌমিক, কম. ফেবি স্ট্যালিন ও কম. শুভায়ু রাইডুকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়।

- Reject NEP;
- Stop Privatization in Education
- Resist Communalism

এই তিন স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত কনভেনশনের প্রস্তাব ও রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পোশ করেন কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা। কনভেনশনের প্রস্তাব ও রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে যথাক্রমে কম. রুবেল সেখ, কম. সায়ন্তন চক্রবর্তী, কম. দেবজ্যোতি দাস, কম. রাজীব হুসেন, কম. আনন্দ, কম. বলরাম সাভেজ, কম. হেকমত মন্ডল, কম. দিলপ্রীত সিং, কম. অজয় কুমার, কম. হেমন্ত কুমার রাঠোর সহ সংগঠনের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র-যুব আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা তথা আর এস পি'র কেন্দ্রীয় নেতা ও সাংসদ কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন।

কম. প্রেমচন্দ্রন তার বক্তব্যে পিএসইউ-এর বিভিন্ন আন্দোলনের অতীত ইতিহাস স্মৃতিচারণা করে বলেন এই নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সর্বাত্মক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং এই আন্দোলনের প্রয়োজনে সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সেই সাথে বলেন বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে পিপিপি মডেলের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন আর এস পি'র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিবু জন ও আরওয়াইএফের সর্বভারতীয় সভাপতি কম. আর এস ডাগর।

কনভেনশনের শেষে সর্বসম্মতিক্রমে পনেরো জন সদস্যের পিএসইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। সদস্যরা হল কম. বিষ্ণু সুরিন্দর, কম. কৌশিক ভৌমিক, কম. আনন্দ, কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা, কম. বলরাম সাভেজ, কম. হাবিবুর রহমান, কম. অজয় কুমার, কম. শুভায়ু রাইডু, কম. গোপি, কম. কিরন কুমার, কম. দিলপ্রীত সিং, কম. হেমন্ত কুমার রাঠোর, কম. সত্য বিজয় যাদব, কম. দেবজ্যোতি দাস, কম. ফেবি স্ট্যালিন। নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন কম. বিষ্ণু সুরিন্দর (কেরালা) ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা (পশ্চিমবঙ্গ) এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কম. অজয় কুমার (দিল্লী)।

পিএসইউ'র জাতীয় কনভেনশনে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের একাংশ।

কনভেনশনের শেষে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সফিউল্লা তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনে দেশ এবং দেশের সংবিধান সংকটে, দেশের ছাত্র যুব কৃষক সহ সমগ্র অংশের মানুষ সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে দেশ এবং দেশের সংবিধান বাঁচানোর এই লড়াইয়ে ছাত্র সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এই কাজে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন হিসেবে পিএসইউ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের সংগঠনের লড়াই সংগ্রামের যে অতীত ঐতিহ্য রয়েছে সেই পথে আগামীদিনে দেশজুড়ে বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজের চলমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এরপর সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে কম. কৌশিক ভৌমিক সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমবেত ছাত্রদের 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'পি এস ইউ জিন্দাবাদ' নয়া শিক্ষানীতি ধ্বংস হোক প্রভৃতি স্লোগানে সভাস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের প্রত্যয়দৃপ্ত অবস্থানে বিশেষভাবে মনে হয়েছে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন সার্থক হয়েছে এবং আগামীদিনে পি এস ইউ একটি শক্তিশালী সুসংগঠিত ছাত্র সংগঠন হিসেবে দেশের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক অতিক্রান্ত। তৃতীয় দশকের দোরগোড়ায় আমরা। দুনিয়া জুড়ে সাধারণ মানুষ ক্রমশই আরও হতশ্বাস। মানুষের বেঁচেবর্তে থাকাটাই সবচাইতে বড়ো সমস্যা। সমস্যা যেন আর কাটতেই চাইছে না। যেটুকু স্বস্তি গতকাল ছিল তা আজ উবে যাচ্ছে। গতকাল যেটুকু অধিকার মানুষ অর্জন করতে পেরেছিলেন তা, নির্বিকারে দিনে রাতে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পরিণত সাধারণ মানুষের নির্বিচার অধিকার হরণ। বিগত দিনে বহুমুখী লড়াই আন্দোলনের মাধ্যমে যেসব অর্জন সম্ভব হয়েছিল তা, বিলকুল ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আগের প্রজন্মের যাঁরা তাঁদের কান্না ঘাম রক্ত ঝরিয়ে কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার আয়ত্ত করে ভেবেছিলেন, পরবর্তীকালে এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনযাপনকে সহজতর করতে আরও অধিকার অর্জনের প্রসঙ্গ আসবে। মানুষ এগোবে সেই লক্ষ্যে। এখন লক্ষ করা যাচ্ছে, যে তিমিরে মানুষ ছিলেন সেই তিমির আরও গভীর হয়েছে। বেমালুম সরকার পরিচালনার ছোট বড়ো মেঝো মুরুব্বিরা নিদান দিয়ে দিচ্ছেন বিগত দিনের বহু যন্ত্রণার বিনিময়ে লব্ধ অধিকারগুলি ছিলই না! সুতরাং তার সুযোগ নিয়ে মানুষের বাঁচার পথ সুগম হবার প্রশ্নই নেই। সেই একটি তৈলাক্ত বংশদন্ডে একটি বাঁদর দশ ফুট ওঠে আর বারো ফুট পিছলে নেমে যায়, কতক্ষণে সেই চল্লিশফুট লম্বা বাঁশটির শীর্ষে বাঁদরটি উঠতে পারবে? গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে যদি তেমন একটি বাঁশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় তাহলে, সম্ভবত বুঝতে সুবিধে হবে যে, আসলে মানুষ ওপরে উঠছে না, ক্রমশই নীচের দিকে তার পতন হচ্ছে।

এমন কঠিন এবং জটিল সমস্যা সারা দুনিয়ার সাধারণ জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে। প্রত্যেকদিন হয়তো মানুষ ভাবছেন, আগামীদিনে হয়তো একটু ভাল থাকবো। পরবর্তীকালেও একই ভাবনা। অথবা আরও সন্ত্রস্ত। যতটুকু ছিল, যা দিয়ে কোনক্রমে দিন গুজরান হচ্ছিল, তা-ও যে নেই! এ এক চরম কান্তিকর ভাবনা। সাধারণ জীবনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। মানুষ চূড়ান্ত হতাশার ভয়াল চোরাবালিতে নিজের অজ্ঞাতেই তলিয়ে যাচ্ছেন।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া। মাঝে মধ্যেই যুদ্ধ। তা হয়তো, ইয়েমেন-এ। কিংবা ইরাক, আফগানিস্তানে অথবা লিবিয়া বা সোমালিয়ায়। অসংখ্য অজস্র মানুষ প্রাণের দায়ে ভিটেমাটি ছেড়ে দেদার দৌড় দিচ্ছেন প্রাণ বাঁচাতে। শিশু, বৃদ্ধ, নারী সহ হয় নিজভূমে পরবাসী নয়তো দেশান্তরী। তিন দেশে পৌঁছে শরণার্থীর জয়টিকা কপালে। শরণার্থী শিবিরগুলিতেও স্বস্তি নেই। গণতান্ত্রিক অধিকার, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি উল্লেখেরও কোনো অবকাশই নেই। মনুষ্যত্বের লাগাতার অবমাননা সর্বগ্রাসী হয়ে মুখব্যাদান করে চলেছে।

ইদানিং সেই করুণ বাস্তবতা গ্রাস করছে ইউক্রেন-এর লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে। হিসেব বলছে প্রায় বত্রিশ লক্ষ মানুষ হয় পোল্যান্ড বা রুমানিয়া অথবা অন্য কোথাও অন্য কোনো শাসকের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে সুদিনের আকুল প্রার্থনায়। প্রাণ বাঁচাতে সবাই দৌড় মারছে শুধুমাত্র একটু বেঁচে থাকার আকুতিতে।

ভারতে যুদ্ধক্রান্ত হবার তেমন কোনো বিপর্যয়কারী অবস্থা আপাতত নেই। হতে কতক্ষণ! শাসক বা শাসকদের মর্জির ওপর তো সব কিছু নির্ভর। সাধারণ মানুষতো উলুখাগড়া। তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন তো এই শাসকদের কাছে সাধারণভাবে নেই। ভোট দেওয়ানোর জন্য অবশ্য প্রয়োজন হয়। এই সব মানুষকে চরমভাবে প্রতারিত করেই তো রাজ্যপাট বহাল রাখে শাসককুল। যে কোনো অজুহাতে ভীতি প্রদর্শন করাও তো বর্তমান শাসকদের বিশেষ পছন্দের অপকর্ম। শাসক বলতেই পারে তোদের খেতে দিচ্ছি, পরতে দিচ্ছি, অতএব কোনও বিষয়ে প্রতিবাদী হয়ে আর কিছুই পাবি না। জীবন শেষ করে দেবো। এই অঘোষিত যুদ্ধ চলছেই। দেশের মানুষের বিরুদ্ধে দেশের শাসকের।

অতীতে বেশ কয়েকবার এ দেশে, এ রাজ্যে গণতন্ত্র পর্যুদস্ত হয়েছে। চণ্ডনীতি অনুসরণ করেছে শাসককুল। সাধারণের জীবনযন্ত্রণা বেড়েছে নানাভাবে। কিন্তু, এমন সূক্ষ্ম ও নিষ্ঠুর পরিকল্পনার মাধ্যমে জনজীবন আক্রান্ত হয়নি। সবকাজেরই একটা পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু গভীর সংশয়, বর্তমান আক্রমণের পিছনে শ্রেণিগত স্বার্থ স্মরণে রেখে এমন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা হয় নি। ভারতে ঘোষিত যুদ্ধের প্রসঙ্গ নেই। জাতিগত ঘৃণা ও প্রাগৈতিহাসিক পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য ধর্মীয় সংস্কারবোধগুলির ব্যাপক ও জ্ঞানশূন্য প্রসার চলছে তীব্র বেগে। এবং তা চলছে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনির আড়ালে। এমন অবস্থা অতীতে কোনকালে ছিল বলে মনে হয় না।

ভারতের সংবিধান যতটুকু অধিকার দেশের মানুষকে দিয়েছে বস্তুত বলে কয়েই সেসব ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর থেকেই নাকি ''অমৃত কাল'' শুরু। নরেন্দ্র মোদির 'আচ্ছে দিন' এর বেলুনটা চুপসে গেছে। লোকে আর আদৌ নিতে চাইছে না। অতএব, নতুন শব্দবন্ধ চাই। এখন মোদির কৃপায় অযোধ্যায় রামলালার ভব্য মন্দির নির্মাণ চলছে। শেষ হবে ২০২৪-এ। কারণ ওই সালেই সাধারণ নির্বাচন। বিজেপি'র জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তো সবকিছু। তা অমৃতকালের ঘোষণাই হোক্ বা 'সেন্ট্রাল ভিস্তা' নাম দিয়ে জনগণের ২০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সব কিছু ভুলিয়ে দেবার প্রকল্পই হোক, সবই ভোট কাড়তে কাজে লাগবে।

এই গভীর চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা এবং অত্যাচারের নীলনকশার কবল থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য কি বামপন্থীরা নিবিড়ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন? আরও ব্যাপক ঐক্য সম্ভাবনা নিশ্চিত করে অবস্থা বা অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলা এখন অতি প্রয়োজনীয়।

আর এস পি প্রতিষ্ঠা দিবস

১৯ মার্চের ভাবনা

আমরা আর এস পি প্রতিষ্ঠার ৮৩তম বছরে প্রবেশ করেছি। ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ বিহারের রামগড়ে বিপ্লবী সমাজবাদী আদর্শের প্রতি আমরা প্রত্যয়শীল রয়েছি কিনা নতুন করে তা, ভেবে দেখার সময় এসেছে। সেদিন যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে আর এস পি'র সৃষ্টি হয়েছিল আজও আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারছি কিনা তা বিচার করতে গেলে সেই দিনটিকে যথাযথভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন।

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরি কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্ভাবনার অভিমুখ পথভ্রষ্ট হল। কারণ, কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ সি এস পি এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত অংশ শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের কূটকৌশলের জালে বন্দী হয়েছিল।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের দোলায়মানতা, বিভিন্ন বাম ও দক্ষিণপন্থী অংশের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ভ্রান্তি, সর্বোপরি দেশের খেটেখাওয়া মানুষের সংগ্রামী মেজাজের ধারা অনুধাবন করার ব্যর্থতা।

এইসব কারণেই ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালেই সুভাষ বসুর আহ্বানে আপসবিরোধী মঞ্চ ফরোয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনে দেশের অগণিত বিপ্লবীরা এসেছিলেন। সেই বৃহত্তর সংগ্রামী মঞ্চে সি এস পি'র অন্তর্ভুক্ত অনুশীলন সমিতি এবং বিপ্লবী শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী সহ শহিদ ভগৎ সিং-এর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফরোয়ার্ড ব্লক মঞ্চের অন্তঃস্থ সেদিনের আগত সেই প্রতিনিধিদের মধ্যে মার্কসবাদে প্রত্যয়শীল বিপ্লবীরা একত্রিত হয়ে প্রকাশ্যে ১৯ মার্চ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আর এস পি আই দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সংকটকে ব্যবহার করে কিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল ভিত্তিটাকে উপড়ে ফেলা যায় তারই পথ খুঁজছিলেন এদেশের বিপ্লবী দল ও সংগঠন সমূহ। তাঁদের চিন্তায় ছিল কিভাবেই বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শ্রমজীবী শ্রেণির নেতৃত্বে সদর্থক জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তীর্ণ করা যায়। কীই বা হবে রণনীতি ও রণকৌশল—তাই অন্বেষণ করছিলেন দেশের বামপন্থী ও মার্কসবাদে প্রত্যয়ী বিপ্লবী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলি।

পাশাপাশি দীর্ঘ তিন তিনটে দশক ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রকেন্দ্রিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর সেই পথ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছিলেন বিপ্লবীরা। দেশের বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী তরুণের দল কারাবাসে পাঠাভ্যাসকালে প্যারিস-কমিউন ও রাশিয়ায় শ্রমিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতাপ্রসূত মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন প্রমুখের দেখানো পথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গণআন্দোলন ভিত্তিক সংগ্রামের পথ অন্বেষণ করছিলেন।

সেই বিকল্প বিপ্লবী পথের দুটি সমান্তরাল ধারায় পার্থক্য কারান্তরালে এবং মাঠে ময়দানে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণমঞ্চগুলি ব্যবহারের পরিসরে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। প্রথম পথটি তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্ন প্রভাবিত সি পি এস ইউ এবং ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি সি পি জি বি'র অনুসারী। আর দ্বিতীয় পথটি কমিনটার্নের প্রত্যক্ষ অনুশাসনের চৌহদ্দী অতিক্রম করে মার্কসবাদী-লেলিনবাদী দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিরিখে দেশের শ্রেণিদ্বন্দ্বসমূহের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে শোষিত জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনের উপাদানগুলির ভিত্তিতে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের পথ।

দ্বিতীয় অনন্য পথ অনুসারী অনুশীলন এইচ এস আর-এর মার্কসবাদীরা রাজপুতানার দেউলি বন্দীশালায় ১৯৩৬ সালেই দলীয় তত্ত্বের খসড়া প্রস্তুত করেন। গোপনে গোপনে দেশের বিভিন্ন কারাগারের সমমতাবলম্বী বিপ্লবী এবং বাইরে গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের পথ পরিত্যাগে আগ্রহী বিপ্লবীরা ১৯৩৯-৪০ সালে কারান্তরালের বাইরে সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন ঐ থিসিসের ভিত্তিতে দলগঠনের জন্য। অবশেষে ১৯৩৯-৪০ সালেই কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সুভাষ বসুর নেতৃত্বের অবমাননা, সরকারি কমিউনিস্ট ও সি এস পি'র নিষ্ক্রিয়তা সেই ঐতিহাসিক সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিল। ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ, রাঁচির কাছাকাছি রামগড়ে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের যে বিচ্যুতিগুলি স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট দল আর এস পি আই গঠনের প্রেরণা জাগিয়েছিল।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসার সময় থেকেই একদা বিশ্ববিপ্লবের প্রবক্তা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের দুরপনেয় বিচ্যুতির সূত্রপাত। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সংকটের সুযোগে দেশে দেশে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র করে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমজীবী শ্রেণির রাষ্ট্রগঠনের রণনীতি ও রণকৌশল থেকে সরে এলেন সেই সব দেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব। প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুসারী লেনিন-রোজা প্রমুখ বিপ্লবীরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের সম্ভাবনায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ১৯১৭ সালে রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ কৃষিভিত্তিক আধাসামন্তবাদী আধাপুঁজিবাদী রাষ্ট্রে লেনিন ও বলশেভিক দলের সময়োপযোগী অনুঘটকের ভূমিকায় শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। শুরু হল সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা। রাশিয়া সহ বিশ্বের মার্কসবাদী বিপ্লবীদের প্রত্যাশা ছিল জার্মানী ইতালি ইংলন্ড সহ ইউরোপের দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রাম এগিয়ে যাবে। সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়ায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশের শ্রমজীবী শ্রেণির রাষ্ট্রকে পাশে পাওয়ার প্রচেষ্টা।

সেই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিক কমিনটার্ন। ১৯১৯ সালে মুখ্যত দেশে দেশে শ্রমজীবী শ্রেণির দল ও সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং উপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের স্বার্থে গঠিত হয়েছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিক। লেনিনের দেহাবসনের পর কালক্রমে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক স্বার্থ ও দেশীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের স্বার্থে পরিচালিত হতে থাকল।

১৯৪৭ সালের ১১-১৩ মে আর এস পি আই-এর দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন

৩-এর পাতার পর

প্রথম বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন, সেখানে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন।

১৩ মে দলের শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে সুদীর্ঘ একমাইল ব্যাপী বিশাল মিছিল মুজাফফরপুর শহর পরিক্রমা করে। এই মিছিলে মুজফফরপুর আর্থার বাটলার কোম্পানী, মুজাফফরপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী, দিল্লী টেক্সটাইল মিলস, টাটা ফ্যাক্টরিস প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী এবং উত্তরপ্রদেশ, বিহার সেন্ট্রাল প্রভিন্স প্রভৃতি রাজ্যের কৃষক প্রতিনিধিবৃন্দ যোগ দিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হন।

সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক কম. যোগেশ চ্যাটার্জীর ভাষণ

কমরেডস,

শহীদ ক্ষুদিরাম বসু এবং বৈকুণ্ঠ শুক্লার স্মৃতিধন্য এই সম্মেলনে আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে আমি ভীষণই গর্বিত। তাদের আত্মত্যাগ আমাদের বিপ্লবের পথ দেখিয়েছে। দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে এরা দেশবাসীকে জাতীয় মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। প্রায় দু'শো বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে প্রজ্জ্বলিত মুক্তি সংগ্রামের শিখা ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবে যে দাবানল সৃষ্টি করেছিল আমরা তার সাক্ষী। মুজাফফরপুরের আপামর নাগরিক সমাজের এই বিপ্লবী গৌরবের অংশীদার হতে পেরে আজ আমি আপ্লুত এবং গর্বিত। আমি শপথ করছি আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সহস্র শহীদের আত্মত্যাগের মূল্যে বিপ্লবের লক্ষ্যের দিকে দায়বদ্ধ থাকব। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিগত অধিবেশনে আমরা সাবধানবাণী ঘোষণা করেছিলাম যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ক্যাবিনেট প্রস্তাব গ্রহণ দেশ ও দেশবাসীর চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব আমাদের সাবধান বাণীতে কর্ণপাত করেন নি। এরা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীল নক্সা অনুসারে প্রস্তুত কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে অংশগ্রহণ করেছে। এই বছর সারা দেশ অভূতপূর্ব বিপ্লবী তরঙ্গে উত্তাল হয়েছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ধর্মঘটে শামিল হয়েছে। অবাধে গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠন ও শোষণের প্রতিবাদে প্রতিরোধে কৃষিজীবী মানুষের পাশে ছাত্র যুব সহ শহরের নাগরিক সমাজ সুতীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে। এমনকি রয়াল ইন্ডিয়ান নেভি এবং রয়াল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স এর সৈনিক সহ পুলিশদের বিদ্রোহকে বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব সাদরে বরণ করে নেয় নি। বরঞ্চ দ্রুত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার স্বার্থে এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানে এরা শঙ্কিত হয়ে নিন্দা করেছেন। যথারীতি ভ্রাতৃঘাতী বিভেদপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বীভৎসার শক্তি সারা দেশের সমাজে বিষাক্ত পরিবেশ নির্মাণ করেছে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সুফল কাজে লাগিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব আমাদের সাবধান বাণীর প্রতি কর্ণপাত না সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনে দুর্দশার অন্ধকার ঘনিয়ে নিয়ে আসছে। অন্তবর্তীকালীন সরকার কোনো মৌলিক সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। এমনকি আমাদের অর্জিত অধিকারও নেই। দুর্ভিক্ষ ও অসহনীয় দারিদ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমশ লুণ্ঠিত হয়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত বাক্ স্বাধীনতা, প্রেস এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পাই নি।এতে কখনই বোঝায় না যে, ভারতবাসী স্বাধীনতার দোরগোড়ায় উপনীত। এতে একমাত্র ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণের স্বাধীনতাই, সাম্রাজ্যবাদের কনিষ্ঠ অনুচরদের জন্য স্বীকৃত হচ্ছে।দেশবাসী ও খেটেখাওয়া মানুষের আর্থিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই প্রকৃত স্বাধীনতা। দেশের বিপ্লবী শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতিনিধির অবস্থান থেকে আমাদের আহ্বান আপনারা যে কোনো মূল্যে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠিত হোন। কারণ, ভবিষ্যত আমাদের। আমরাই পারবো প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে তা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন। আপস আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। রক্তাক্ত বিপ্লবী পথেই সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সম্ভব। দেশের প্রতিটি বিপ্লবী মানুষ ও শক্তির কাছে আমার আহ্বান, সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

আর এস পি'র ৮৩তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য'র আহ্বান

আজ ১৯ মার্চ। আমাদের প্রিয় দল রেভোল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টির ৮৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ভারতের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পটপ্রেক্ষায় একটি যথার্থ আপস বিরোধী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় এই দিনে। সেই সময়কালে তীব্রতম পর্যায়ে উন্নীত দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে গণআন্দোলন। সেইসময়েই একটি সঠিক মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আশ্রিত আন্তর্জাতিকতার উদ্বোধনে এই রাজনৈতিক দলটির প্রতিষ্ঠা অবশ্যই এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা।

আমাদের দলটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য সার্থক করতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে। আমাদের দল নির্দিষ্টভাবে মনে করে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যথার্থ ফললাভ করতে বিফল হয়েছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি অর্ধসমাপ্ত থেকে গেছে। আধখেঁচড়া অবস্থায় সেই আন্দোলন পরিত্যক্ত হয়েছে। আর এস পিকে নিবিড়ভাবে অনুশীলন করে দেশের জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি অর্জন করা পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মহান পথ অনুসরণ করতে হবে।

ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করে চলেছে। লুণ্ঠন করে চলেছে। তারা দেশের মানুষদের বিভাজিত করা কুৎসিত ষড়যন্ত্র করে চলেছে অবিরাম। এই দেশটিকে ধর্মের নামে জাতের নামে খণ্ডবিখণ্ড করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের রাজনৈতিক দল। দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা এবং অবিশ্বাসের আবহ নির্মাণ চলছে। দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তাও ধ্বংস করে ফেলার ষড়যন্ত্র করতে মোদি-শাহ ও তাঁদের দলবল।

এই শাসকেরা তাদের অর্বাচনী ও জনস্বার্থ বিরোধী কর্মসূচি চালাচ্ছে বিপুল বেগে। হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য। এখনই তারা হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে মুহুর্মুহু ঘোষণা করে চলেছে। এই সবই চলছে সংকটগ্রস্ত বিশ্বপুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষায় নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ সচেতন হয়েই আরও ব্যাপকভাবে শোষিত মানুষের দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলে আপসবিহীন সংগ্রামের পথে চলতে হবে।

ভারতে হাতে গোনা ধনকুবেরদের এবং তাদের আন্তর্জাতিক দোসর বিপুলাকার বহুজাতিক কর্পোরেট কোম্পানিগুলির অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করার পথে উদগ্রভাবে চলেছে মোদি সরকার। বিজেপি ও কিছু আঞ্চলিক দলের রাজ্য সরকারগুলিও একই পথে ধাবমান। এই ভয়াবহ অনৈতিক অবস্থার মোকাবিলায় ব্যাপক বাম ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে। গণআন্দোলনের চরম আঘাতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া শক্তিকে প্রতিহত করতেই হবে।

Vol. 68 Issue No. 47 শনিবার ২৬ মার্চ, ২০২২ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

রাজ্যের ধান চাষে কর্পোরেট ভাইরাস : রাইস মিল কিনছে আদানি

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

আন্দোলনের চাপে প্রত্যাহার করা হয়েছে তিনটি কেন্দ্রীয় কৃষি আইন। তবু হাল ছাড়ে নি বড় বড় কোম্পানি। কৃষি ব্যবস্থায় আধিপত্য কায়েম করতে এখন রুগ্ন রাইস মিল কিনছে আদানি গোষ্ঠী। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে জৌগ্রামে তারা এরমধ্যেই একটি বড় রাইসমিল কিনে নিয়েছে। সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, মিলের আশেপাশের অনেকখানি জমিও তারা কিনেছে। সেখানে নাকি বড় গোডাউন হবে। শুধু একটি নয়, এই জেলার অনেক রুগ্ন রাইসমিলের ওপরেই তাদের নজর পড়েছে। জলের দরে সেগুলি তারা কিনতে চায়। যদিও কোম্পানির পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে, তারা একটি রাইসমিলই কিনছে। কথাটা যে এক্কেবারে মিথ্যা তা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আদানিরা পূর্ব বর্ধমানে হাওয়া খেতে বা ছুটি কাটানোর বাগানবাড়ি করতে রাইসমিল কেনেনি। কোম্পানির লক্ষ্যই হল চাল ব্যবসায়ে একচেটিয়া আধিপত্য। তারজন্য একটি বা কয়েকটি রাইসমিল কিনে তারা বসে থাকবে না। কালক্রমে তাদের কাছেই কৃষকদের ধান বিক্রি করতে বাধ্য করবে। আজকের স্থানীয় ফড়েদের জায়গা দখল করবে কোম্পানির এজেন্ট। সরকার কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের গপ্পো শুনিয়ে বাজার গরম করবে।

এক-দেড় দশকের মধ্যেই উল্কাগতিতে উত্থান হয়েছে আদানি গোষ্ঠীর। তাদের ফরচুন ব্র্যান্ডের ভোজ্য তেল, আটা, চালসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ছেয়ে গেছে নগরের মল থেকে গ্রামের মুদির দোকান স্থানীয় ছোট কোম্পানিগুলির তেলের টিনের বদলে সুদৃশ্য মোড়কে ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ভোজ্য তেল। ব্র্যান্ডেড কোম্পানির চাল, আটা এখন দেশের বিকাশের প্রতীক। বিনিময়ে বন্ধ হয়েছে অনেক ছোট কোম্পানি। খাদ্যপণ্যের বাজার চলে গেছে কতগুলো কর্পোরেট সংস্থার নিয়ন্ত্রণে। ফলে, লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে খাদ্যদ্রব্যের দাম। আদানি গোষ্ঠী অনেক আগেই ফুড কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তি করেছে। বিভিন্ন খাদ্যশস্য ঝাড়াই-বাছাই করে তারা মজুত করবে, বন্টনের ব্যবস্থা করবে। এফ সি আই'র কাজের ভার তুলে নিয়েছে আদানি গোষ্ঠীর আদানি এগ্রি লজিস্টিকস লিমিটেড (এ এ এল এল)। কোম্পানির দাবি কৃষকরা এর ফলে সঠিক দামে ফসল বিক্রি করতে পারবেন। কৃষকের থেকে সরাসরি ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেশজুড়েই কর্পোরেটদের ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। ভোজ্য তেলের ব্যবসা করতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তৈলবীজ চাষের এরাই নিয়ন্তা।কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন ছিল সেই নীতির পথে একলাফে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র। আইন আপাতত বাতিল হয়েছে। কিন্তু সরকারি নীতি বদলায় নি।

ভোটের ময়দানে তরজায় মেতে থাকা অধিকাংশ দলগুলির মধ্যেই কর্পোরেট দালালির প্রশ্নে কোনো পার্থক্য নেই। বরং দালালির প্রতিযোগিতায় তারা মত্ত। কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের অনেক আগে থেকেই তৃণমূল সরকার সেই কাজে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। 'এগিয়ে বাংলা' স্লোগানটি এক্ষেত্রে অনেকখানি সার্থক। বাংলায় চুক্তি চাষের আইনি ভিত মজবুত করা হয়েছে। ২০১৪ সালে কৃষিপণ্য বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন করা হয়। পরের বছরে আইনের বিধি জারি হয়। ব্যক্তি মালিকানায় কৃষি বাজার খোলা ও ই-ট্রেডিং-এর অনুমোদন দেওয়া হয়। মতলব পরিষ্কার। সরকারের ফসল কেনার ব্যবস্থা দুর্বল করে ব্যক্তিমালিকানাকে সুবিধে করে দেওয়া। যার সুযোগ নেবে কর্পোরেট সংস্থাগুলি। বিজেপি সরকারও নয়া কৃষি আইনে সেই যুক্তিই দেখিয়েছিল। দাবি করেছিল, এরফলে ই-ট্রেডিং এর মাধ্যমে কৃষক সঠিক মূল্যে ফসল বেচতে পারবেন। তারা স্বাধীন হবেন। স্বাধীনতার মোড়কে যে তাঁদের কর্পোরেট দানবদের শিকারে পরিণত করা হচ্ছে, তা বুঝতে কৃষকদের অসুবিধে হয় নি। সাত-আট বছর আগে থেকেই তৃণমূল সরকার এই রাজ্যে সেই জমি প্রস্তুত করেছে।

এম এস পি ঘোষণা করে সরাসরি ফসল কেনার ব্যবস্থা এই রাজ্যে আগে থেকেই দুর্বল। যেটুকু ব্যবস্থা ছিল তাকেও রুগ্ন করে ফেলা হয়েছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে কিষাণ মান্ডি হয়েছে। কৃষকের বিশেষ উপকারে লাগে নি। অধিকাংশ কৃষকই সরকারি মূল্যে ধান বেচতে পারেন না। এই মরশুমেই সরকারের নির্ধারিত মূল্য ছিল, কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা (কেন্দ্রীয় ক্রয় কেন্দ্রে বাড়তি ২০ টাকা)। অধিকাংশ কৃষক আমন ধান কুইন্টাল প্রতি ১৪০০-১৫০০ টাকা দরে বেচেছেন। গত মরশুমে বোরো ধান বেচেছিলেন, ১৩০০-১৭০০ টাকা কুইন্টাল দরে। লোকসান হলেও, ফড়ে, মহাজনদের কাছে তাঁরা ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হন। নিয়মের বেড়াজালে, ধান কেনার সুবন্দোবস্ত না করে সরকার কৃষকদের অভাবী বিক্রিতে বাধ্য করে।

তার সঙ্গেই রয়েছে চাষের খরচ বৃদ্ধি, কৃষি সরঞ্জামের কালোবাজারি। দেনা মেটাতে অধিকাংশ কৃষক সরকারি ভরসায় থাকতে পারেন না। আমন ধানে অধিকাংশ কৃষকের লোকসান হয়েছে। তার আগে বোরো ধানে হয়েছিল। এই মরশুমে বোরো ধান রুইতেই খরচ বহুগুণ বেড়েছে। পটাশের দাম কিলোপ্রতি বেড়েছে ২০-২৫ টাকা। ডিএসপি'র দাম বস্তা প্রতি (৫০ কেজিতে এক বস্তা) বেড়েছে ৪০০-৫০০ টাকা। ইউরিয়া বেড়েছে বস্তাপিছু ১৫০-২০০ টাকা। এন পি কে ১০ : ২৬ : ২৬ এর দাম বস্তাপিছু বেড়েছে ৬০০-৭০০ টাকা। সারের দামের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। একই কোম্পানির সার একেক জায়গায় একেক দাম। আবার চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ছে। মাঝে মাঝে চমক দিতে সরকারি কর্তারা দোকানে হানা দেয়। তারপর সব চলে আগের নিয়মেই। কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে, তারসঙ্গে বাড়ছে কালোবাজারি। ডিজেল, কেরোসিনের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতেও চাষের খরচ বেড়েছে। ধান লাভজনক ফসল হলেও, এখন লোকসানই নিয়ম হয়ে গেছে। ধানের ভাণ্ডার বলে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই তাই কৃষক ধানের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

কৃষি সরঞ্জামের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা কৃষি দপ্তর থেকে বিতরণ নিয়ে চূড়ান্ত দুর্নীতি সরকারি নীতিরই অঙ্গ। কালোবাজারি, ফড়েরাজের মাধ্যমে ফুলে ফেঁপে উঠছে অবৈধ কারবারের অর্থনীতি। যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে শাসক দলের অনুগত লুম্পেনবাহিনী। আর সেই সুযোগেই আসরে নামছে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা। এলাকার লুঠেরাদের চেনা যায়। কিন্তু এইসব কর্পোরেটদের আসল রূপ প্রথমে বোঝা যায় না। মানুষের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে এরা আসে ত্রাতার বেশে। নানারকম সুযোগের কথা বলে, প্রচারের মাধ্যমে কৃষকদের মন জয়ের চেষ্টা করে। ফড়ে, মহাজনদের কাছে ঠকতে ঠকতে, সরকারি ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হতে হতে কৃষকরা তখন এদের ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হন। বিকাশ বা উন্নয়নের নামে সরকারই এদের প্রচার করে। সরকার যদি গ্রামে গ্রামে কেন্দ্র করে কৃষকের থেকে ফসল কেনার ব্যবস্থা করত, সার, বীজ, কীটনাশকের কালোবাজারি বন্ধ করত তাহলে কর্পোরেটদের আসার সুযোগ হত না।

বেসরকারি টেলিকম কোম্পানিদের সুযোগ দিতে বি এস এন এলকে রুগ্ন করা হয়। বেসরকারিকরণের জন্য সরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়। একই লক্ষ্যে কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে ফসল বিক্রির ব্যবস্থা সরকার করে না। কৃষকের সর্বনাশেই কর্পোরেটদের পৌষমাস। এই রাজ্যের খনি, বন্দর, কৃষি সবেতেই মোদির নয়নের মণি আদানি গোষ্ঠীর নজর পড়েছে। তৃণমূলের সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠতা সকলের জানা। ২০১৮ সালেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে এগ্রি লজিস্টিকসে বিনিয়োগের জন্য আদানি গোষ্ঠীর মৌ স্বাক্ষরিত হয়।

আদানি গোষ্ঠীর বদলে আম্বানি, টাটা বা অন্য কোনো কর্পোরেট এলেও বিপদের হেরফের হয় না। কর্পোরেটদের মধ্যে প্রগতিশীল বা 'ছোট' শত্রু হয় না। নয়া উদারনীতির পথেই কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির আগ্রাসন বাড়ছে। কৃষি সরঞ্জাম থেকে ফসলের বাণিজ্য সবকিছুতে কর্পোরেটদের দখল চাই। চাই কৃষিজমি।

খুচরো ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশে সেই সুযোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কর্পোরেটগুলি মল থেকে ই-কমার্স সবেতেই পুঁজি বিনিয়োগ করছে। হয় কোম্পানি কিনছে, নাহলে অংশীদারত্ব বাড়াচ্ছে। দীর্ঘ দু'বছরের অতিমারি তাদের অনেকখানি সুযোগ করে দিয়েছে। লকডাউনে বেড়েছে ই-কমার্স। বেড়েছে ডিজিটাল লেনদেন। ২০২০ সালে সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠে গ্রামীণ ই স্টোর। গ্রামে খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা। স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কৃষকদের থেকে ফসল কেনার ব্যবস্থা হয়। গত বছর আদানি গোষ্ঠী এই উদ্যোগের ১০ শতাংশ অংশীদারত্ব কিনে নেয়। এত সামান্য অংশীদারত্বে অবশ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করা যায় না। কিন্তু আগামীদিনে অংশীদারত্ব বাড়িয়ে বা যৌথ উদ্যোগে গ্রামে ই-কমার্সে বৃদ্ধির এটা প্রাথমিক পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে তারা কৃষকের থেকে সরাসরি ফসল কেনার সুযোগ পাবে। সেই ফসল কেবল গ্রামীণ ই-স্টোরেই বিক্রি হবে না। এই গোষ্ঠীই গত বছর এপ্রিল মাসে ফ্লিপকার্টের সঙ্গে অংশীদারি কারবারের চুক্তি করেছে। আম্বানি গোষ্ঠী ফিউচার গ্রুপের বিগ বাজার অধিগ্রহণ করছে। আবার মার্কিন কোম্পানি সিলভার লেক ২০২০ সালে খুচরো ব্যবসার জন্য আম্বানি গোষ্ঠীর শেয়ার কেনে। তারা জিও প্ল্যাটফর্মেরও কিছু শেয়ার কিনেছে। ফেসবুকও জিও প্ল্যাটফর্মে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও টেলিকম পরিষেবার মাধ্যমে ই-কমার্সের ব্যবসা বাড়ানো লক্ষ্য। এভাবেই মল থেকে ই-কমার্সে খুচরো ব্যবসার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে দেশ বিদেশের নানা কোম্পানি জোট গড়ে তুলছে। যে খুচরো ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা।

কর্পোরেট সংস্থার রাইস মিল কেনার বিপদ এখানেই। কৃষকদের অভাবী বিক্রির সুযোগ নিয়ে তাঁদের প্রলোভিত বা বাধ্য করা কঠিন নয়। সরকার ময়দান ছেড়ে দিলে কৃষকরা এদের কাছে ফসল বেচতে বাধ্য। ফড়ের বদলে থাকবে কোম্পানির এজেন্ট। বাজার দখল করতে প্রথমে ফসলের দাম তারা বেশি দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ছোট রাইসমিলগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। হয় বন্ধ হবে, নয় কর্পোরেটরা কিনে নেবে। তখন এদের কাছে ধান বিক্রি করা ছাড়া কৃষকদের হাতে বিকল্প কিছু থাকবে না। কার্যত কৃষকদের দর কষাকষির ক্ষমতা থাকবে না। কৃষকদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শুরু হবে চুক্তি চাষ, জমি কেনা। পূর্ব বর্ধমানের গোবিন্দভোগ সহ বিভিন্ন সুগন্ধী চালের খ্যাতি আছে। সুগন্ধী এই চালের রপ্তানি হয়। আগামীদিনে এইসব সুগন্ধী চালের ব্যবসা চলে যাবে কর্পোরেট দখলে। একটি রাইস মিল বা সামান্য পরিমাণ শেয়ার কিনে এভাবেই কর্পোরেট দানবেরা আসরে নামে। ধীরে ধীরে সব গ্রাস করে। কেবল চাল নয়, অন্যান্য ফসল চাষ ও বিক্রিতেও কর্পোরেট সংস্থাগুলির আধিপত্য বাড়বে। রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে এদের দখলদারি ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে। বিপদ শুধুমাত্র কৃষক বা ছোট ব্যবসায়ীদের নয়। ক্রেতাদেরও। ভোজ্য তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি থেকে যা সহজেই বোঝা যায়। এখন ফুড কর্পোরেশনের সঙ্গে কর্পোরেটেরা চুক্তি করছে। এমনিতেই গণবন্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর সার্বিকভাবে গণবন্টন ব্যবস্থাই লাটে তোলা হবে। তাই নিছক শাসক দলের বদল নয়, সরকারি নীতির বদল চাই। দেশের জমি, খনি, জল সব লুঠ করার 'উন্নয়ন' মডেলকেই প্রশ্ন করতে হবে। কর্পোরেটের প্রতি মোহ নয়, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণি ঘৃণাই পারে প্রতিরোধ গড়তে।

সমাজতান্ত্রিক দর্শনবোধ ও নিবিড় চর্চা ব্যতীত কোনো বিপ্লবী সংগঠন হতে পারে না

৪-এর পাতার পর

যাচ্ছে। বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় আর এস পি বলেছিল গরীব মানুষের বিভাজনের জন্যে বৃহৎ পুঁজির দালাল বিজেপির এই প্রচেষ্টা। বিজেপির শাসনে মহিলারা বিশেষ করে, দলিত মহিলারা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

মুসোলিয়মে লেনিনের মরদেহ মস্কোয় শায়িত রেখেই লেলিনবাদের অবমাননা শুরু হয়। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান নেতা ভ.ই লেনিন বারংবারই বিপ্লবীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজোর ছলে তাঁদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁরই মরদেহ সংরক্ষণ করে নীতিচ্যুতি শুরু হয়ে যায়।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দেশের মূলধারার কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার সমালোচনা করেন। তিনি বর্তমান সময়ে দেশের সাধারণ জীবনের সমূহ সর্বনাশ সৃষ্টিকারী মোদি এবং মমতার অপশাসনের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সমস্ত বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিশেষ তাৎপর্যের ব্যাখ্যা করেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বহুসংখ্যক কমিউনিস্টের সবিশেষ ভূমিকা থাকলেও তা পরবর্তীকালে ভুল সিদ্ধান্তের ফলে অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। সবশেষে তিনি আগামী ২৮, ২৯শে ধর্মঘটকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে গণবার্তা তহবিলে প্রায় দশ হাজার টাকা উপস্থিত পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীগণ তুলে দেন। আর এস পি জেলা অফিস এদিন চেইনফ্ল্যাগ, চাইনিজে সুসজ্জিত করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর পুনরায় এরকম মার্ক্সীয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে সভাপতি সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

প্রতিবেদক : কম. নারায়ণ সামন্ত

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-